শতবর্ষের বাংলা

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীমতিলাল রায়

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস্।

চন্দননগর

[মূল্য বার আনা

চন্দননগর,
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস হইতে
প্রকাশিত।

"প্রবর্ত্তক" হইতে পুনর্মুদ্রিত

সাধনা প্রেস, চন্দননগর

প্রকাশকের নিবেদন

—:*:—

পূজার সংখ্যা "প্রবর্ত্তক" নিমেষের মধ্যে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাসিক ছাপায় বহু পাঠক-পাঠিকার চাওয়া পূরণ করতে পারি নি বলে', তাঁ'দের আগ্রহাতিশয্যে এই "শতবর্ষের বাংলা" বই আকারে প্রকাশ করলুম। বাংলার কথা বাঙ্গালীর হৃদয়ের নৈবেদ্য রূপেই সমাদরে গৃহীত হবে—এই আকাঙ্খা বুকে নিয়ে সাহিত্য-সমাজ ও তরুণমণ্ডলীর কাছে বইখানি উপহার এনেছি। কয়েকখানি নূতন ছবি সাজিয়ে দেওয়ায়, বইখানির সমৃদ্ধি বেড়েছে।

মায়ের আশীর্ব্বাদে, আশা আছে এ'র দ্বিতীয়খণ্ডও নিরাপদে পাঠক-পাঠিকাগণের হাতে পৌছে দিতে পারবো।

———

ওঁ

ভূমিকা

—:*:—

হাওয়া কি আবার ফিরিয়াছে, ফিরিতেছে? না হইলে বাংলার কথা লেখেই বা কে, শোনেই বা কারা? একদিন বাঙ্গালী বাংলার দিকে ছুটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিংশ কোটী ভারতবাসীর কথা কহেন নাই।

সপ্তকোটীকণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে!

বলিয়া মায়ের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ভারতের মোহে পড়িয়া এই ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রের সপ্তকোটীকে ত্রিংশ কোটী করিয়াছে। তারপর, বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সে স্বাধীনতার সাধনায় সে আজ মাতিয়াছে তাহা বাঙ্গালীর সনাতন সাধনা। প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া এই অর্ব্বাচীন কালেও, বাঙ্গালী শতবর্ষ ধরিয়া নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে এই এক লক্ষ্যের দিকেই ঋজু কুটিল নানাপথে

ছুটিয়াছে। আজ লোকে যাহা নিতান্ত নূতন ভাবিতেছে, তাহা বাংলার ইতিহাসে পুরাতন। আর মতের বা পথের পার্থক্য নিবন্ধন আজিকার নব্য বাঙ্গালী নিজেদের স্বাদেশিকতার অভি-মানের কুজ্ঝটিকায় যাঁহাদের স্বদেশ প্রেমের মর্য্যাদা করিতে পারি তেছে না, তাঁহারাও এই মহাযজ্ঞেরই একদিন প্রধান হোতা ও পুরোহিত ছিলেন। রামমোহন কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা নহেন কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য মনীষা নূতন বাংলারই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ কেবল মহর্ষি নহেন, কিন্তু বাংলার নূতন স্বাধীনতার একজন শ্রেষ্ঠতম সাধক। কেশবচন্দ্র কেবল নববিধানই প্রচার করেন নাই, বাংলার আধুনিক জাতীয় সাধনারও একজন প্রধান আচার্য্য ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আজ লোক-নায়কের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। লোকনায়কেরা বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিলে সর্ব্বত্র এই দশা ঘটে। লোকমত খরবেগে অগ্রসর হইয়া যায়। লোকনায়কেরা সকলে সকল সময়ে এই তরঙ্গভঙ্গের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু নব্য বাঙ্গালী জানে না, তাহার আজিকার এই স্বদেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার আস্ফালন অসম্ভব হইত, যদি সুরেন্দ্রনাথ আপনার মনীষা এবং বাগ্মিতা দ্বারা একদিন এই মহাযজ্ঞের আগুন না জ্বালাইয়া দিতেন। বাংলা যে কি বস্তু, বাঙ্গালীর এই সনাতন স্বাধীনতার সাধনার স্বরূপ যে কি, ইহা তলাইয়া দেখিবার অবসর আজ বাঙ্গালীর নাই। বাঙ্গালী আত্মহারা হইয়াছে; অথবা, মাঝখানে হইয়া পড়িয়াছিল; আবার মনে হয় যেন বাঙ্গালীর মতি ও গতি ফিরিতে আরম্ভ

করিয়াছে ; না হইলে শত বর্ষের বাংলার কথা লিখিতে প্রেরণা আসিত কোথা হইতে ; আর এই পুণ্য কাহিনী শুনিতই বা কারা ? আমাদের আধুনিক সাধনার, আধুনিক মাতৃপূজার পবিত্র নির্ম্মাল্যরূপে এই কাহিনী যদি বাঙ্গালী মাথায় তুলিয়া লয়, তবেই লেখকের কামনা পূর্ণ হইবে।

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল

ভবানীপুর,
কলিকাতা।
৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি
গরীয়সী

শতবর্ষের বাংলা

যুগ-গুরু

—:*:—

পূর্ব্বাবস্থা

১১৭৬ সালের মন্বন্তরের প্রসঙ্গ তুলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠে" এই চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন :— "লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘর বাড়ী বেচিল, জোত জমা বেচিল! তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা অনেকে বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।"

ইহা উপন্যাসের কল্পনা নয়—সত্য। "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের" কথায় এখনও বাঙ্গালীর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে—দুর্ভিক্ষের এমন মর্ম্মান্তিক দৃশ্য জগতের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাইবে না। দারিদ্র্যের নির্ম্মম কষাঘাতে সেই যে বাঙ্গালীর প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, আজও তাহার দুরবস্থার প্রতিকার হয় নাই।

হইবে কি প্রকারে?—বাংলার এই দেড়শত বৎসরের ইতিহাস অনুধাবন করিয়া দেখ—বাঙ্গালীর বাঁচিবার পথ নাই। বিন্দু বিন্দু জীবন নিঙড়াইয়া রক্তস্রোত নিরন্তর শতমুখে বাহির হইয়া যাইতেছে—বাঙ্গালী এখনও যে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায় নাই—উহা বিধাতার আশীর্ব্বাদ—কিন্তু বড় নিষ্করুণ—তিলে তিলে মরার চেয়ে এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে একদিনে একেবারে তাহাদের নিশ্চিহ্ন হওয়াই ছিল ভাল।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির পর হইতেই, বাঙ্গালীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে, দিল্লীর রাজশক্তি হীনবল হওয়ায়, মহারাষ্ট্রীয় শক্তির অভ্যুত্থান হয়, শিবাজীর মৃত্যুর পর এক শতাব্দী কাল যাইতে না যাইতেই মহারাষ্ট্রীয় শক্তি রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় উদাসীন হইয়া লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যগ্র হইয়া পড়ে, বাংলায় এই বর্গীর অত্যাচার দমন করা আলিবর্দ্দীর সাধ্যে আর কুলায় নাই, সেই দিন হইতে বাঙ্গালী ধনে প্রাণে মরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইহার পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট সাহ আলামের নিকট হইতে ইংরাজ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হন, এই দিন হইতে এই জাতির ভবিষ্যতের আশায় ছাই

পড়িল—ইংরাজরাজ্যের ভিত্তিতলে বাংলার কোটী কোটি নরকঙ্কাল স্তরের পর স্তর বিন্যস্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলি :—"......বাংলার কর ইংরাজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরাজেরা আপনার কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে সেখানে তাঁহারা এক একজন কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না।"

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজস্ব আদায় আরম্ভ করিল। ১৭৬৬।৬৭ খৃষ্টাব্দে জোতদার, তালুকদার, জমিদার প্রজার উপর পীড়ন জুড়িয়া দিল, ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বিধাতার কোপ অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া দেশকে পুড়াইয়া ছাই করিল, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীর চক্ষে অশ্রু ঝরিল, তারপর ৭৬ সালের কথা বলিতে ভাষা জুটে না, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—যে শুধু এক মুষ্টি অন্নের অভাবে, কেবল বাংলায় ৭৬ সালের পৌষ মাস হইতে ভাদ্রের মধ্যে এক কোটী লোক প্রাণ হারাইল। কলিকাতা যদিও একালের মত সে সময় সমৃদ্ধ ছিল না, কিন্তু ইংরাজের দৃষ্টির সম্মুখেই ৭৬০০০ হাজার লোক পথে পড়িয়া ক্ষুধার জ্বালায় ইহধাম পরিত্যাগ করিল। এই প্রায় দুই কোটী অস্থিকঙ্কালের উপর বাংলার ব্রিটীশরাজ বনিয়াদ গাড়িয়া আজও সেই একই অবস্থায় আমাদের শাসন করিতেছেন—দেড়শত বৎসর কৃতাঞ্জলীপুটে রাজসেবা করিয়াও আমরা মুক্তির আশ্বাস পাইলাম না। জাতির মর্ম্ম পুড়িয়া গেল, বিদ্বেষের বিষাক্ত ধূম উদ্গীরণে

দেশের শান্তিশৃঙ্খলাভঙ্গের যে ক্ষীণ উদ্যোগ মাঝে মাঝে দেখা দেয় তাহা মুমূর্ষু জাতির আত্মরক্ষার অনিবার্য্য অভিব্যক্তি।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী সনন্দ পাইয়া, ইংরাজ প্রথম দুই বৎসর রাজস্ব আদায়ের তেমন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তারপর ১৭৬৮—৬৯ হইতে শোষণ নীতির স্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। এক বৎসরেই আদায় করিয়া লইলেন, ২ কোটী ৫২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮ শত ৫৬ টাকা। তারপর দারুণ দুর্ভিক্ষের বৎসর খাজনা আদায় বন্ধ রহিল না, সে বৎসর রাজস্ব উঠিল ১ কোটি ৩১ লক্ষ, ৪৯ হাজার ১ শত ৪৮ টাকা। ঘরে ঘরে হাহাকার, মহামারীর প্রকোপে পথে ঘাটে পড়িয়া লোক মারা যায়, ইংরাজের রাজস্ব আদায় হয় কি প্রকারে? ইংরাজ জমিদারের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ তখন বাংলার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, দশ বৎসরের জন্য বার্ষিক দেয় রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া, যথারীতি খাজনা উঠাইয়া লইলেন, সেই সময় হইতে ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার ফল ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে বলা যায় না। কেন না মুসলমানদের শাসনাধীনে, বাংলার ভূমাধিকারী-গণের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইংরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজস্ব না দিলে, জমিদারী নিলামে চড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। জমিদারদের এই নূতন নিয়ম ধাতে বসিতে না বসিতেই, কোথাও অর্থাভাবে, কোথাও অসতর্ক স্বভাব বশতঃ তাহাদের প্রভাব হ্রাস পাইতে লাগিল, জমিদারদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। বাংলার ভূম্যধিকারীই সে যুগে এক প্রকার দেশের

রাজা ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা এই দশশালা বন্দোবস্ত হওয়ার পর, অনতিকালমধ্যেই ৮৪টি পরগণা হারাইয়া মাত্র ৫।৭ খানা পরগণার মালিক রহিলেন। বাঙ্গালী এইরূপে শক্তি-শ্রী-মর্য্যাদা হারাইয়া ক্রমেই প্রবল ইংরাজশক্তির আসনতলে মাথা ঠুকিয়া স্বার্থসংরক্ষণে উদ্যোগী হইল। মিশনারীদের সার্টিফিকেট লইয়া ইংরাজের চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া পড়িল। তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে যত সংখ্যক ইংরাজী শব্দ মুখস্থ করিতে পারিত, শ্রীরামপুরের মিশনারীরা সেই হিসাবে সার্টিফিকেট দিতেন। বাঙ্গালীর অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমা কোথায় গিয়া ঠেকা খাইবে, তাহা আজ নির্দ্ধারণ করা সহজ কথা নহে।

সে যুগে বাঙ্গালী ধর্ম্মের চেয়ে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই বড় করিয়া ধরিয়াছিল, প্রতিমা-পূজার মধ্যে সত্যকে হারাইয়া কে কত বড় প্রতিমা গড়িয়াছে, কত টাকার সাজ করিয়াছে, কত লোক খাওয়াইয়াছে, এইরূপ জাঁকজমকের মাত্রা ধর্ম্মের ধ্বজা হইয়া উড়িত। সমাজের জঘন্য রুচির পরিচয় পাই ঝুমুর, কবি, তরজার লড়াই প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায়, তাছাড়া অবরোধের কঠিন নাগপাশে কুললক্ষ্মীদের জীবন কি ভীষণরূপে আড়ষ্ট হইয়াছিল, তুচ্ছ ছাগবলির মত সতীদাহে বলপূর্ব্বক তাহাদের জীবনে কি নৃশংসরূপে আঘাত দেওয়া হইত, শতবর্ষের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের আর এই সকল কথা বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন নাই।

সমাজপুরুষেরা নিত্য নৈমিত্তিক আহ্নিক জপ করিয়াই

নিজেদের ধার্ম্মিক মনে করিতেন। অন্ত্যজ জাতি বলিয়া দেশের একতৃতীয়াংশ লোক দারুণ উপেক্ষায় সমাজের বাহিরে অনাদরে পশুর অধম হইয়াছিল, অথচ গো-খাদক ম্লেচ্ছের সারাদিন চরণ বন্দনা করিয়া, সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নানান্তে প্রাচীনেরা শুচি হইতেন, নামজাদা ধার্ম্মিক পুরুষের রক্ষিতা পূজা পার্ব্বণে অন্তঃপুরে বসিয়া সম্মান পাইত, কুললনাদের মর্ম্মান্তিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস সংসারে দাবানল সৃষ্টি করিত।

এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন যুগে মরণের বিষাক্ত নিঃশ্বাসভরা মুমূর্ষু সমাজজীবন প্রতি মূহুর্ত্তে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, জীবনের আশা ছিল না বলিলেই হয়, এই মরা প্রাণে যে মহাপুরুষ সঞ্জীবনী সুধা ছিটাইয়া বাঙ্গালীকে নব জন্মের দীক্ষা দিলেন, তিনি এ যুগের পূজ্য দেবতা, গুরু-রূপী শ্রীভগবানের বিগ্রহমূর্ত্তি—যুগপুরুষগণের আদিসূত্র, আমরা তাঁহার চরণে বিহিত বিধানে নমস্কার করি।

* * * *

যুগাবতার রাজা রামমোহন রায়

—•—

জাতির ভবিষ্যৎ যদি ধর্ম্মজীবনের অটল ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহাহইলে তরুণ কর্ম্মীদের যুগপুরুষগণের স্মৃতিপূজা জীবনসাধনার অপরিত্যজ্য অঙ্গ করিয়া লইতে হইবে। অতীতের প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আমাদের

রাজা রামমোহন রায়।

ধমনীতে ধমনীতে শক্তির অনাহত উৎস সঞ্চারিত করিবে। আমরা দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে সিদ্ধ কর্ম্মীরূপেই, ভবিষ্যৎকে আমাদের সত্যে গড়িয়া তুলিতে পারিব। নব যুগের প্রবর্ত্তক হিরণ্ময় কিরীট মাথায় পরিয়া জাতির সম্মুখে ঐ দাঁড়াইয়াছেন,—বাঙ্গালী, বারম্বার ভূনত হইয়া ইঁহাকে প্রণাম কর।

একশত বৎসর অতীত হইল, প্রতীচ্যের দানে বাংলার তৎকালীন সঙ্কীর্ণ জীবনে জগতের আলো জ্বালিয়া তুলিবার জন্য, যুগ-পুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের প্রযত্নে, লর্ড আমহার্ষ্টের সহায়তায় কলিকাতার বুকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এ জাতির জীবনের উৎস যদি গভীর, অতলস্পর্শী না হইত, তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে এতদিন সমূলে উৎপাটিত হইয়া, আমরা উপজাতির মত মর্য্যাদাহীন হইতাম। রাজার দূরদৃষ্টি জাতির জীবনের পরিচয় পাইয়াই ইহাকে সমৃদ্ধ করিতে জগতের বাধা উপেক্ষা করিয়াছিল। রক্ষণশীল দলের মৃত্যুবীজ চাপিয়া রাখার যে মুষ্টিবদ্ধ জীবন, তাহা নির্ম্মম অস্ত্রোপচারে নিরাময় স্বাস্থ্যপূর্ণ করিবার সুযোগ দিয়াছিল। গোঁড়া হিন্দুগণ, রাজার বিরুদ্ধে ছিলেন বলিয়া, রাজা হিন্দু কলেজের ভাবী উন্নতি আশায়, স্বয়ং কার্য্যকরী সভা হইতে অপসৃত হইয়া, শিক্ষার পথ প্রশস্ত রাখিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার উদার হৃদয়েরই পরিচয়।

রাজা হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু বদ্ধ ধর্ম্মসংস্কার হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। স্বাধীন রাজ্য তিব্বতের মুক্ত :বায়ুর স্পর্শে ধন্য হইবার জন্য, ১৬ বৎসর বয়সেই

তিনি হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, ফরাসীর গণতন্ত্র রাজ্যের ত্রিবর্ণ চিত্রিত সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়ধ্বজা দেখিয়া কি হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই,পরাধীন জাতির জীবনে, স্বাধীনতার বীজ বপন করিতে তিনি যে জীবনপণে উদ্যত হইবেন, এ কথা কে অস্বীকার করিবে !

তাঁর সর্ব্বকর্ম্মে আমরা এইরূপ মুক্তিকামীর অগ্নি-আকাঙ্খাই নিহিত দেখি। বাংলার ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে যখন তিনি দেখিলেন, অব্রাহ্মণের বেদে অধিকার নাই, জাতির প্রাণ শূদ্রশক্তি উপেক্ষায়, অসম্মানে হীনতার স্তরে গিয়া লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, তখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে জাতির মূলভিত্তি ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁর ধর্ম্ম অহিন্দুর ধর্ম্ম নয়, তাঁর সার্ব্বভৌমিক উদার ধর্ম্মনীতির প্রভাবে, খৃষ্টান মিশনারীরা প্রথমে প্রলুব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অন্ধ হিন্দু জাতির বিভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম ধর্ম্মসাধনার সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া, রাজার কর্ম্মে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল, অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দু-জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষগণও এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে বড় কম বাধা দেন নাই, কিন্তু সত্যকে কে চাপিয়া রাখিবে ? শত বৎসর পূর্ব্বে "ধর্ম্মসভার" প্রচেষ্টা আজ জাতির জীবনে কতটুকু প্রভাব রাখিয়াছে? ব্রাহ্মসমাজ দেশব্যাপী না হউক, রাজার ধর্ম্মভাব বাঙ্গালীর জীবনে কি অমানুষিক প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে, তাহা ভাবিলে কি আমরা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ঐ বিরাটকায় উদার নির্ভীক যুগপুরুষের দিকে সম্ভ্রমে মাথা নত করি না ! রাজা

হিন্দু জাতির, হিন্দুসমাজের, হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা সাধনার মধ্যে যে অমর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন, তাহা কালের সঙ্গে গুণান্বিত হইয়া সমগ্র জাতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, সে অমর বীর্য্য ধ্বংস হইবার নহে।

যে জাতি-বন্ধনের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর পরিবেষ্টনে, বাংলার সাড়ে চার কোটী লোকের মধ্যে নিদারুণ ভেদ পার্থক্যে সর্ব্বক্ষেত্রে নিজেদের আজ বিপন্ন মনে করি, এখনও শত বৎসর হয় নাই, তাহার মূলোচ্ছেদের জন্য জলদগম্ভীর স্বরে, তাঁর ধর্ম্মমত প্রচার করিতে গিয়া রাজা বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলেএস, ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করি। যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কেন হও না, সকলে এস, সার্ব্বভৌমিক ভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য অনাদ্যনন্ত পর ব্রহ্মের পূজা করি।"

এই উদার আহ্বান ধর্ম্মক্ষেত্রে, প্রত্যেক ঈশ্বরদর্শীর কণ্ঠেই আজ ধ্বনি তুলিয়াছে, কিন্তু সেদিন এমনি উদাত্ত কণ্ঠে, জাতি-সমন্বয়ের বাণী প্রচার বড় সহজ ছিল না, ধর্ম্মমতের জন্যই রাজার জীবন প্রতিপদে বিপন্ন হইয়াছিল, তিনি নির্ভীকভাবেই আত্মবিশ্বাসের জয় দিয়া বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন।

শুধু ধর্ম্মে নয়, নারী জাতির মুক্তির জন্য তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম, প্রচলিত সমাজের সঙ্কীর্ণ বিধান ভাঙ্গিয়া কুললক্ষ্মীদের মুক্ত আলো ও হাওয়ার পরশ দিতে তাঁর প্রাণপাত আয়াস—তুলনাহীন।

প্রাচীনেরা ছেলে ক্ষেপাইয়া রাজার পশ্চাতে যখন পরিহাসের

সুর তুলিয়াছিল, অবোধ বালকেরা যখন গলা ছাড়িয়া পল্লী কাঁপাইয়া গাহিত

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎ সৎ বলে বেটা বানিয়েছে কুল,
ও সে জেতের দফা করলে রফা
মজালে তিনকুল,—

তিনি হাসিয়াই সব উড়াইতেন। সতীদাহের পৈশাচিক ব্যবস্থা যাহাতে না উঠে, তাহার জন্যও সংস্কারবিরোধী হিন্দুপ্রধানেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠক, একটী চিত্র আঁকিয়া দেখাই, শত বৎসর পূর্ব্বে আমরা নারীজাতির প্রতি কিরূপ সদয় ছিলাম।

প্রজ্জ্বলিত চিতাসজ্জা প্রদক্ষিণ করিয়া নারী যেমনই ঝাঁপাইয়া পড়িল, দহনজ্বালায় পরিত্রাহি আর্ত্তনাদ শুনিতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে শত ঢাক বিকট রবে বাজিয়া উঠিল, কিন্তু হতভাগিনী ছিট্‌কাইয়া চুল্লী হইতে সরিয়া নিকটস্থিত জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইল। শবদাহকারীরা চিতানল নির্ব্বাপণ কালে দেখিল, অস্থি একটী, তখন তাহারা সন্ধান করিয়া দেখিল, অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় সতী বনের মধ্যে আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতেছে, আর রক্ষা নাই, তাহাকে ধরিয়া নদীবক্ষে হাত পা বাঁধিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইল। যে জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস এমন নৃশংস আচরণে প্রশ্রয় দেয়, সে জাতির জীবন মন্থন করিয়া একটা পরিচ্ছন্ন, উদার, সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার আয়ো-

জন যিনি করিয়াছেন, যাঁর আত্মদানের ফলে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাধনায়, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সমাজে, আমরা অতীত কুসংস্কারের দায় হইতে এতখানি মুক্তি পাইয়া নবজীবন গঠনের সুযোগ পাইয়াছি, তাঁহাকে যুগপুরুষ না বলিয়া আর কি বলিব!

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণ হয়, অতঃপর তিনিই নারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবলাকুলের জীবনে জ্ঞানের বাতি জ্বালিবার প্রথম ও প্রধান পুরোহিত হইয়াছিলেন।

শুধু ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার লইয়াই তাঁর জীবনের আয়ুঃ শেষ হয় নাই। রামমোহনের জীবনপ্রবাহ ক্ষীণ তটিনীর মত একমুখী ছিল না, সহস্রধারে দেশ ও জাতির মুক্তি বিধানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাকে মানুষ বলিলে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয় না, তিনি সত্যই অতিমানবতার মূর্ত্ত বিগ্রহ, মহাবিভূতির দিব্য মূর্ত্তি (super-man)।

আজিকার দুর্ব্বল জীবন, ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, যেমন জাতির অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবস্থা ব্যবস্থার দিকে শক্তি নিয়োগে কুণ্ঠিত হয়, রাজার জীবন তেমন ছিল না, তিনি রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অনেক ব্যক্তির এই প্রকার সংস্কার আছে, যে, যিনি পরমার্থ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তিনি রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে পারেন না। ধর্ম্মজ্ঞ শুধু ধর্ম্ম লইয়া থাকিবেন, রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। আবার যিনি রাজনীতিজ্ঞ, তিনি কেবল রাজনীতির আলোচনাতেই ব্যস্ত থাকিবেন, ধর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা

নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর মত। ধর্ম্ম ঈশ্বরের, রাজনীতি কি শয়তানের ?"

ইহার পরও যাঁহারা, এই পরাধীন দেশের রাষ্ট্রচর্চ্চা ধর্ম্ম-সাধনার অনুকূল নহে বলিয়া, নিজ অক্ষমতা ঢাকিয়া বিশিষ্ট নীতি গড়িয়া বসেন, তাঁহাদের কথা আর না বলিলেও চলে।

কত বলিব, এই শত বৎসরে বাংলা অধ্যাত্ম সাধনার যে স্তরে উঠিয়াছে, তাহার ভিত্তিতলে যে সব যুগপুরুষগণের আত্মদান আছে, তাঁহাদের চরিত কীর্ত্তি আলোচনা করিলে এক একখানি বেদ গড়িয়া উঠে, আমরা বাংলার এই শক্তিসাধনার যুগে, আত্মাশক্তির এই সব বিগ্রহমূর্ত্তির চরণে পূজার্ঘ্য প্রদানের জন্য, কেবল উপাসনার মন্ত্র রূপেই সংক্ষেপে কয়েকটী কথার অবতারণা করিলাম। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রাজার রাজনীতিক আন্দোলনের ফল। তিনি উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রিমকোর্টের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রবল আন্দোলন তুলিয়া সে নিষ্পত্তি রহিত করিয়াছিলেন, লাখরাজ ভূমি বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, ইংরাজকে বুঝাইয়াছিলেন, যে এরূপ হইলে, যে প্রজামতের উপর ইংরাজরাজ্যের ভিত্তি, সে ভিত্তি টলিবে, চায়নার সহিত ভারতের অবাধ বাণিজ্যনীতির তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। বহুমুখী জীবনপ্রবাহে বাংলাকে ভাসাইয়া, রাজা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। হায়, ইহাই মহাযাত্রা, রাজা আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তাঁর অমর সত্তা পরবর্ত্তী যুগে অমিত বিক্রমে জাতিকে নূতনের দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বাংলার বিগত শতাব্দীর ইতিহাস ভবিষ্য জাতিগঠনের বিপুল উদ্যোগপর্ব্ব,

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবযুগের কর্ম্মীদের অতীত শতাব্দীকে জাগ্রত স্মৃতির মধ্যে সসম্মানে রাখিয়া কর্ম্মোদ্যত হইতে হইবে।

* * * *

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

—•—

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা বেদের সত্য ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ গড়িয়া যান। কিন্তু ধর্ম্মবাদের সহিত সংগ্রাম করিতেই তাঁহার সময় ক্ষয় হইয়াছিল, তিনি এই নব ধর্ম্মমতে ও বিশ্বাসে ব্যবহারিক জীবনের ভঙ্গীগুলিকে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিবার অবকাশ পান নাই। সে কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথ নবযুগের ঋষি-স্রষ্টা, তিনি প্রাচীন ধর্ম্মের বাঁধন কাটিয়া, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০ জন সহতীর্থের সহিত যুগধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্ম্মের কুসংস্কার হইতে জাতিকে মুক্তি দিবার জন্য,রামমোহন অপেক্ষা মহর্ষিকেই খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত অধিক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। রামমোহনের মধ্যে জাতীয়তার দীপ্ত বহ্নি বিপ্লবধূমে আচ্ছন্ন ছিল, মহর্ষি জাতীয় ভাবের দাবানল জ্বালাইয়া তুলিলেন, দেবেন্দ্রনাথের তপোবলেই জাতি সত্য ও আলো দেখিল, অন্ধসংস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

মহর্ষি, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুজাতির সহিত পাছে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তাহার জন্য সতর্ক থাকিতেন। তিনি রামমোহনের অন্তরেচ্ছাটী

জীবনময় করিয়া প্রচার করিতেন—"আমরা কিছু নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি না,...চিরকাল ধরিয়া যে ধর্ম্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে—তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।" তিনি আরও বলিতেন, "হিন্দু প্রথা, হিন্দু রীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে—হিন্দু সমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দু রীতি নীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে।

এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শত বৎসর পূর্ব্বে রাজার জীবনে যে সত্য প্রেরণা জাগ্রত হইয়া, তাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত বিরোধ বাধাইয়াছিল, সে বিরোধের হেতু হিন্দুত্বকে বিনাশ করা নহে, পরন্তু কাল প্রভাবে ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে, তাহা দূর করিতে ভগবান যেমন স্বয়ং অবতীর্ণ হন, রাজাও তদ্রূপ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ বাংলায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যুগধর্ম্মের বিজয়-শঙ্খনিনাদে হিন্দুজাতির মোহ যে বহুল পরিমাণে অপসারিত হইয়াছে, পরবর্ত্তীযুগের ধারাবাহিক ধর্ম্মপ্রবাহ তাহার নিদর্শন। রামমোহনের পর মহর্ষির আগমন না ঘটিলে, যুগধর্ম্মের ছন্দ রক্ষিত হইত কিনা সন্দেহ।

বাংলার পলিমাটিতে বেদান্তের প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ চিরদিন অনাদৃত হইত—আগম নিগম বামাচার বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবল ছিল—তাহার উপর গৌড়ীয় ভক্তিতত্ত্ব সোণায় সোহাগা হইয়াছিল—বাংলার শক্তিবাদ রসাশ্রিত ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া, বাঙ্গালীর চরিত্রে নারী প্রকৃতির আরোপ করিয়াছিল। রাজাই সে কুসুম-কোমল জীবনে বজ্রের কাঠিন্য গুণ অনুপ্রবিষ্ট করেন, তাই তিনি

বলিতেন—এজাতি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মই অনুষ্ঠান করিবে। তিনি পৌত্তলিকতা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মবিধির উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, রক্ষণশীল জাতি সহজে এই যুগপুরুষের উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, জাতিকে উৎসন্ন দিতেই তাঁর আবির্ভাব, এইরূপ কলঙ্ক রটাইতেও দেশ পশ্চাৎপদ হয় নাই, স্বজাতির প্রতি তাঁর অসাধারণ মমতা গতানুগতিক পন্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতেন বলিয়া, অনেকের চক্ষেই পড়ে নাই, তিনি কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিতেন—"জাতীয়ভাবে সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বজনীনভাবে জাতীয় হইতে হইবে"—তাঁর এই জাতীয়তা মহর্ষির জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যেদিন একজন যুবক তাঁর স্ত্রীকে লইয়া খৃষ্টান মিশনারীদের আশ্রয় লইল, হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দুরাকাঙ্খা জাগিতে আরম্ভ করিল, মহর্ষি সেদিন হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য কি প্রাণপাত শ্রম করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। হিন্দুধর্ম্মের সাররত্ন বেদান্ত মন্থনে আবিষ্কার করিয়া, তিনি কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধুর সহিত একযোগে কর্ম্মোদ্যত হইলেন, মহর্ষির হিন্দুহিতৈষী সভা প্রভৃতি হিন্দুত্বকে রক্ষা করিবারই বিপুল উদ্যোগ।

এই নবধর্ম্মের অমর প্রেরণায় তাঁর সবখানি অনুপ্রাণিত হইলেও, জাতীয় ভাবকে রক্ষা করার অতিমাত্রায় ঝোঁক থাকায়, তিনি ধর্ম্ম ও সমাজের বাহ্যিক সংস্কারচিন্তা কল্পনায় প্রশ্রয় দিলেও, কার্য্যে করিয়া উঠিতে সাহস করিতেন না। জাতীয় জীবনে স্বচ্ছ ধর্ম্মবল আনয়ন করাই যেন তাঁর জীবনের কার্য্য ছিল, বেদ

উপনিষদ ছাঁকিয়া তিনি উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্বগুলিকে সময়োপযোগী জীবনের ব্যবহারে আনিয়াছিলেন—ইহা অল্প সামর্থ্যের পরিচয় নয়, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পর, রাজার ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তখন মহর্ষি যদি অটলপদে ইহা না ধরিতেন, তাহা হইলে আজ আর ইহার চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

*   *   *   *

সাধু রাজনারায়ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

—০—

মহর্ষির মানসপ্রকৃতি মহাসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, তাই তিনি কোন নূতন সংস্কার কালে বেশ ইতস্ততঃ করিতেন, অনেকক্ষেত্রে বিরোধী হইয়া উঠিতেন—এই কারণে ব্রাহ্মধর্ম্মের আগল ভাঙ্গিয়া মহর্ষিকে দূরে সরাইয়া বাংলার আর একজন মহাপুরুষ ধর্ম্মের তুফান তুলিলেন, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় পরে দিতেছি।

মহর্ষির সহকর্ম্মীরূপে আর এক মহাপুরুষের নাম এখানে উল্লেখ-যোগ্য। তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ ছিলেন, এই যুগপুরুষের জীবন হইতে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়— ইনি যশস্বী রাজনারায়ণ বসু।

তিনি কলিকাতায় শিক্ষার জন্য আসিয়া, মহর্ষির সহিত আলাপ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে
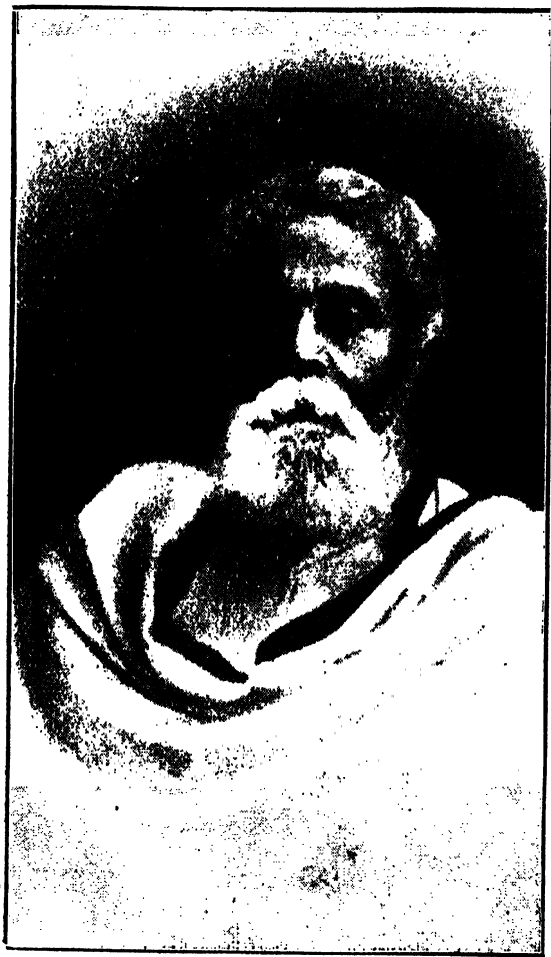
৺রাজ নারায়ণ বসু।

ব্রাহ্ম সমাজের কাজে আত্মদান করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজার অভ্যুদয় হইতে এই সময়টীকেই বাংলার নবজন্মকাল বলা যাইতে পারে. বাঙ্গালী অতীতের মোহ কাটাইয়া, ভবিষ্যৎ বৃহৎ জীবনের জন্য জাতি হিসাবেই এই সময়ে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে, বাংলার আধুনিক সর্ব্ববিধ জীবনীশক্তি বিকাশের মূল অন্বেষণ করিলে, এই যুগের দিকে সম্ভ্রমদৃষ্টি আকর্ষিত হয়,—দেশের পূজ্য যুগ-পুরুষগণের এমন একত্র সমাবেশ কোন কালে ঘটে নাই।

সাধু রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিয়া ইহার মধ্যে জাতীয়তার যে প্রবল আগুণ জ্বালাইয়া তুলিলেন, সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার তুলনা মিলিল না। ব্রাহ্মমতে তিনি জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বিবাহ দেন, এই কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্রই শ্রীঅরবিন্দ। এইজন্য অনেকে রাজনারায়ণকে "জাতীয়তার দাদামহাশয়" বলিয়া সম্মান প্রদান করেন।

রাজনারায়ণ জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে জাতীয়তার গৌরব প্রচার করেন। তিনি "An old Hindu's hope" নামক যে ইংরাজী পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন—তাহা হইতেই তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি কি উচ্চ ধরণের ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, তা ছাড়া হিন্দুত্বের উপর এমন অসাধারণ মমতা অনেক গোঁড়া হিন্দুর মধ্যেই দেখা যায় না। তাঁর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া শুধু বাংলা নয়, ভারতের সর্ব্বত্র ধন্য ধন্য রব উঠিয়াছিল—৺দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ সোম-প্রকাশে লিখিয়াছিলেন, "হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল—

রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন।" ইহা বড় কম গৌরবের কথা নয়। রাজার প্রথম ধর্ম্ম প্রচার কালে, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতি ও সমাজের মূল শিথিল করার উগ্র বিষ বলিয়া ঘৃণায় অনেকেই মুখ ফিরাইতেন, সেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অতুলনীয় শক্তির স্পর্শে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-যুগ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল,—হিন্দুপ্রধান পরম গুণগ্রাহী ভূদেববাবু নিজের উপবীত রাজনারায়ণ বাবুর কণ্ঠে জড়াইয়া বলিয়াছিলেন—"রাজনারায়ণ, তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আমরা তোমার তুলনায় কিছুই নয়।"

সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া শেষ বয়সে তিনি স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়াছিলেন, দেওঘরে বাসকালে পাণ্ডারা তাঁহার সাধুতার গুণে বলিতেন—'ও আমাদের দোসরা বৈদ্যনাথ!" বাঙ্গালীর জীবনে আজও যে জাতীয়তার গর্ব্ব, হিন্দুত্বের মহিমা আমরা অনুভব করি, সে পরশের মধ্যে রাজনারায়ণের অমর আশীর্ব্বাদ আছে, বাঙ্গালী তাই তাঁকে যুগপুরুষ বলিয়াই চিরদিন পূজা করিবে।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের স্বর্ণদেউল ভাঙ্গিবার সূত্রপাত ঘটিল, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের অমানুষিক নব প্রেরণার অতুল অধ্যাত্ম উত্তেজনার প্রবাহে, ব্রাহ্মসমাজের রীতি বিধির মধ্যে ব্রহ্মানন্দের স্থান হইল না।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রদীপ্ত সূর্য্য যখন বাঙ্গালীকে প্রখর কিরণে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, সেই সময় সমাজের ধর্ম্মবিশ্বাসে ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। মহাত্মা রামমোহনের পন্থানুসরণ করিয়া, মহর্ষি বেদের উপর অভ্রান্ত বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক আত্মানু-

কেশবচন্দ্র সেন।

ভূতির সাহায্যে ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিলেন। সমাজের মধ্যে এতদিন মতবিরোধের কোন কারণ ঘটে নাই, কিন্তু ডফ প্রমুখ খৃষ্টান মিশনারীগণের প্রভাবে, ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রশ্ন উঠিল, বেদকেই অভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রধান উপাদান না করিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি আত্মপ্রত্যয়ের উপরে নিহিত করা হউক। মহর্ষির সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে শেষোক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসই ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্বরূপ স্বীকৃত হইল। এই আত্মপ্রত্যয়মূলক ধর্ম্মবিশ্বাসের অটল প্রতিষ্ঠার উপর দাঁড়াইয়া, পরবর্ত্তীযুগে কেশবচন্দ্র নব নব বিধানে ব্রাহ্মধর্ম্মের অদ্ভুত আকার দিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা, কোন বিশেষ শাস্ত্রগ্রন্থের অনু-শাসনে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু তাঁর মুহুর্মুহু আঘাতে সমাজের প্রাণশক্তি প্রমাদ গণিয়াছিল। মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরো-ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা পুরাতন সৃষ্টির বুকে এরূপ নির্ম্মম আঘাত দিয়া নূতনের অভ্যুত্থান সম্ভব করিয়া তুলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এতখানি সত্যদৃষ্টি লইয়াও তাঁহারা মহর্ষির ধর্ম্মে আত্মদান করেন নাই।

যে সত্য রাজার মধ্যে অবতরণ করিয়া জাতির জীবনে সঞ্চারিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা যদি সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িত, ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইত না। তাই কেশব চন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশিষ্ট রূপ দিতে গিয়া ইহার মূল শিথিল করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুর জীবনে বলবিধান করিল, ছাঁচ ভাঙ্গিল; সত্য প্রেরণা কিন্তু ব্যর্থ হইল না।

কেশবচন্দ্র একখণ্ড উল্কার মত বাংলার জীবনে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নবতন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেও, নব শক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গাঘাতে প্রাচীন সমাজের বাঁধ ভাঙ্গিতে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের সত্যানুবৃত্তি নিখুঁত সৃষ্টির পথে পুরাতনের সহিত আপোষ করে নাই, বরং সংগ্রাম করিয়াছে। নিরন্তর প্রবাহে গিরিবক্ষও বিদীর্ণ হয়, সত্য প্রেরণার অজস্র স্রোতোধারায় পরিশেষে তাঁর ঐহিক শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কেশবচন্দ্র আজ অশরীরী হইয়া দেশের বুকে এখনও বিদ্যুৎ ছড়াইতেছেন। সমাজবিপ্লবের কোলাহল আজিও নীরব হয় নাই, জাতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্বাস্থ্যপূর্ণ স্বচ্ছন্দ জীবন দিতে তাঁহার অমোঘ শক্তির অব্যক্ত ধ্বনি আজিও স্তব্ধ হয় নাই।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের পর, মহর্ষি সুধীজনের কণ্ঠে নূতনের নির্ভীক আহ্বান ঋক্‌মন্ত্রের মত ঝঙ্কার দিতেছিলেন, তখন এই তরুণ কর্ম্মী কলিকাতা নগরীর মধ্যে আত্মপ্রতিভার উন্মেষসাধনে তৎপর ছিলেন।

খৃষ্টান মিশনারীর মত, আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান্ মিশনারিগণের এক দল ছিল। এই দলের প্রতিনিধি ড্যাল সাহেব ও সুবিখ্যাত পাদ্রি লং সাহেবের সহিত সমবেত হইয়া, কেশবচন্দ্র বৃটিশ ইণ্ডিয়া সভা সংগঠন করেন। এই সভার সম্পাদকরূপে নিজ ভবনে সান্ধ্য সভায় ছাত্রদের লইয়া তিনি বক্তৃতা দিতেন। তরুণ ছাত্র-সমাজ কেশবচন্দ্রের সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। তিনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "Good-will fraternity" নামে যুবকদের জন্য আর একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় মহর্ষি আহূত

হইয়া কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা ও প্রতিভার পরিচয় পান ; ইহার পর হইতেই উভয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপন হয়। কেশবচন্দ্র ইহার পর বৎসরেই ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। মহর্ষি তখন স্থানান্তরে ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে কেশবের মত উৎসাহী কর্ম্মী পাইয়া তিনি বিশেষ পুলকিত হইয়াছিলেন।

তখন কে জানিত, কেশবের শক্তি মন্থনে ব্রাহ্মসমাজ উৎখাত হইয়া, আজিকার মত হতশ্রী ও শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। কেশবের ছন্দহীন ভৈরব পুলকনৃত্যে ব্রাহ্মসমাজ টলটলায়মান হইল। প্রথম প্রথম মহর্ষি কেশবের সকল কর্ম্মে উৎসাহ দিতেন, পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, কিন্তু কেশবের প্রতিভা, ও প্রকৃতির মধ্যে, জাগরণের উদ্দাম চাঞ্চল্য ও নিত্য নূতন সৃষ্টির দিকে এমন প্রবল আবেগ দেখা দিতে লাগিল, যে শুধু মহর্ষি কেন, সাধু রাজনারায়ণ প্রভৃতি অনেকেই তখন ব্রাহ্মসমাজের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায়, কেশবের আচরণে মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের সুর তুলিতে আরম্ভ করিলেন। কেশবের মত বীরকর্ম্মীর জীবনভারে ব্রাহ্ম সমাজ প্রমাদ গণিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, ইহাতেও তাঁর প্রতিভার ঠাঁই হইল না, সঙ্গত সভার আয়োজন করিলেন, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, ব্রাহ্ম সমাজের কাজে জীবনের সবখানি ঢালিয়া দিলেন। তিনি সংসার হইতে বিতাড়িত হইয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যের পদে নিয়োজিত হইয়া, হৃদয়ের অদম্য আবেগে, বাংলার বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইলেন। সারা ভারত কেশবের শক্তির পরিচয় পাইয়া

উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের সে যুগ বড় গৌরবময় যুগ।

মধ্য আকাশে সূর্য্য উপনীত হইলে দশদিক প্রখর কিরণে উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই সূর্য্যকে অস্তাচলের পথে অবতরণ করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের সৌভাগ্যসূর্য্য কেশবের প্রতিভায় সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধরিয়াই স্তিমিত হইয়া পড়িল। গোল বাধিল ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, কেশবচন্দ্র যখন দুইটী অসবর্ণ বিবাহের আয়োজন করিলেন। ব্রাহ্মমতে বিবাহ আইনসম্মত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, যখন দেখিলেন ব্রাহ্মসমাজ ইহাতে আপত্তি করিবে, তখন তিনি সিবিল মতেই ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত করিলেন। কেশব নূতনের প্রেরণায় এমনই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, যে টাউন হলে এই প্রসঙ্গের বক্তৃতায় তিনি বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না, "The term Hindu does not include the Brahmos." দূরদর্শী রাজনারায়ণ কাতর কণ্ঠে বলিলেন—"ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় দিবস সেই দিন, যেদিন কেশব আপনাকে হিন্দু বলিতে অস্বীকার করিল।"

সত্যই এতদিন ব্রাহ্মগণ নিজেদের হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র বোধ করিত না। মহর্ষি যদিও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেশবের সহিত মিলিত হইয়া নিজ কন্যার নূতনমতে বিবাহ দিয়াছিলেন, পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সমাজবিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন না, হিন্দু হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন বোধে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। কেশব বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা সভায় মহিলাদের অবাধ আসন গ্রহণের ব্যবস্থায়, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মদের

আচার্য্য বলিয়া অস্বীকার করিয়া ব্রাহ্ম সমাজকে একটা আনকোরা নূতন ছাঁচে ঢালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিরোধের আগুন জ্বলিল। ব্রাহ্মসমাজের মন্দির ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মহর্ষির বাড়ীতে উপাসনার ব্যবস্থা হয়। কেশবের দল গিয়া দেখিল, আচার্য্যের আসনে উপবীতধারী ব্রাহ্মেরা বসিয়াছে, তখনই তিনি স্বতন্ত্র স্থানে প্রার্থনাসভার আয়োজন করিলেন। এ বিরোধ আর মিটিল না। কেশবের অমানুষিক প্রেরণাবলে, তরুণ ব্রাহ্মেরা অভাবনীয় অধ্যাত্ম অনুভূতিতে উন্মাদ হইয়া উঠিল, নগ্নপদে তরুণ ব্রাহ্মেরা রাজপথে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেশবের উদ্যোগে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নূতন উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করা হইল, দলে দলে তরুণ ব্রাহ্মেরা গান ধরিল :—

"নর নারী সাধারণের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতি বিচার॥"

অন্তর বাহির সমান করিতে গিয়া, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রভাবে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত কেশবের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি সমাজের অধ্যাত্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তাঁর "ভারত আশ্রম" এক নূতন আদর্শ, ধর্ম্মপ্রচারকদের একত্র রাখিয়া, প্রার্থনা ও আরাধনার মধ্য দিয়া অধ্যাত্ম জীবন গঠনের বিচিত্র আয়োজন। তাহার পর 'সাধন কাননে,' সাধকদের অধ্যাত্মজীবনের উন্মেষ সাধনের জন্য

তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, রাজপ্রতিনিধি-গণকে লইয়া তিনি সমদর্শীদল গঠন করেন।

কেশবের শক্তির সীমা ছিল না। কিন্তু কুচবিহারের বিবাহ ব্যাপার লইয়া, তাঁহার দলের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়। তিনি নিজেকে তাঁহার পুরাতন দলের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া, নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনব্যাপী পরিশ্রমে এই সময় তাঁহার শরীরে দারুণ বহুমূত্র রোগ প্রবেশ করে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবের দিন শেষ হয়। সারা জীবনে তিনি বাংলার অধ্যাত্মযুদ্ধে জয়ছত্র উড়াইতে যে শ্রম ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। রাজার জীবনের উপর ভর করিয়া বাংলায় যে সত্যধর্ম্ম অবতরণ করিয়াছিল, যাহার প্রভাবে, মহর্ষি প্রমুখ প্রবীণ ব্রাহ্মগণ ঘুরপাক খাইয়া, ইহাকে জাতির জীবনে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পথ পাইতেছিলেন না, কেশবচন্দ্র সংকর্ষণের মত এই সত্য বারিধিবক্ষ মন্থন করিয়া প্রবলবেগে আছাড়িয়া পড়িলেন—জাতির সনাতন তীর্থ-মন্দিরে।

দক্ষিণেশ্বরের সূত্র কেশবচন্দ্র জাতির হস্তে তুলিয়া দিয়া যান। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যুগধর্ম্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, একদিন বেল-ঘরিয়ার উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হন। ইহাতেই মণিকাঞ্চন সংযুক্ত হইল; কেশব যে ধর্ম্মভার বহিতেছিলেন, তাহা ঠাকুরের জীবন-বেদীতে যে দীপ্ত যজ্ঞকুণ্ড জ্বলিতেছিল, তাহাতেই নাকি আহুতি দিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিলেন। অধ্যাত্ম জীবনেতিহাসের পর্য্যায়ে ইহা আমরা নির্ভুল এবং অনিবার্য্য দিব্যনীতি বলিয়া

ধরিয়া লইতে পারি। সাধক বিজয়কৃষ্ণ যাহা নিজমুখে বলিয়াছেন তাহাতে অপ্রত্যয়ের কোন কারণ নাই—"তিনি (কেশব) ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া তিনি যেখানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণ-চিন্তা করিতেন, সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে বলিয়াছিলেন……তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।"

কেশবের নববিধান এই দিন হইতে অমর হইয়াছে। ইহার পর হইতে, কেশবচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণামকালে বলিতেন—"জয় নববিধানের জয়।" এ কথার সাক্ষ্য দিবার খাঁটী মানুষ এখনও জীবিত আছেন। ঠাকুরের সহিত কেশবের পরিচয় আবার একটা নূতন যুগের জন্ম দিয়াছিল। কেশবের মুখে ঠাকুরের মহিমা শুনিয়াই, নরেন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি যুগের মানুষ আসিয়া সমাগত হন। ঠাকুরের সহিত কেশবের সম্মিলনের পর হইতে কেশবচন্দ্র ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন। কেশবচন্দ্রের সহিত ঠাকুরের অধ্যাত্ম সম্বন্ধের পরিচয় আমরা ঠাকুরের মুখ হইতেও শুনিতে পাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগ করার কথা শুনিয়া, তিনি তিনদিন শয্যাত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কথা—"এই কথা শুনে মনে হয়েছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ ছিঁড়ে গেল।" এই অভেদ পরিচয়ের অধ্যাত্মহেতুর মর্ম্মভেদ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত নন, তাঁহাদের কথা আমরা ছাড়িয়া দিই। সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া থাকার জীবন্ত ইতিহাসের

সচল নজীর ভিন্ন তাঁহাদের জীবনের অন্য কোন মূল্য নাই। আমরা দেখিতে পাই, বাংলায় ধর্ম্মপ্রবাহের অনাহত ধারা জীবনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে, কোন্ পথে ছুটিয়াছে! যে অধ্যাত্ম বেদীর উপর জাতির ভবিষ্যৎ স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইবে, সেই সনাতন নীতিটি আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিব, যুগপুরুষগণের satelliteদের বিভ্রান্তকারী ঔজ্জ্বল্যে আমরা বিভ্রান্ত হইব না। বাঙ্গালী সম্প্রদায়বিশেষকে পুষ্ট ও রক্ষা করিতে জন্মে নাই। বাঙ্গালী জন্মিয়াছে, জাতিরূপে জাগিতে, রক্ষা পাইতে। সে ক্রমবর্দ্ধনশীল গতি, অধ্যাত্মানুভূতির উচ্চভূমির উপরেই ক্রমোন্নীত হইবে। তাই আমরা নিঃসংশয়ে কেশবচন্দ্রের জীবন ছানিয়া যুগধর্ম্মের প্রবল প্রবাহটিকে দক্ষিণেশ্বরে খুঁজিয়া পাই; এবং এই গঙ্গোত্রীধারার উৎসমূলে, যে মহাদেবতাকে দেখি, তাঁরই চরণমূলে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সে অমর দীক্ষা ব্যর্থ হইবার নহে। এইবার এই পুণ্যকাহিনীর অবতারণা করিব।

* * * *

ঠাকুর রামকৃষ্ণ

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ হয়, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দক্ষিণেশ্বরের মহিমা বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়া উঠে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা ছাড়া কেশবচন্দ্রের জীবনসাধনার
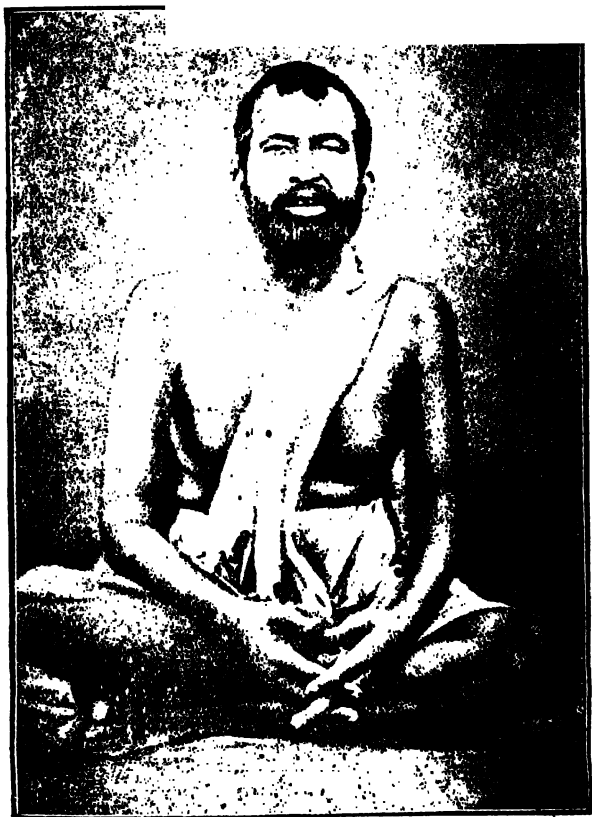
ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

সহিত ঠাকুরের অন্তর্ম্মুখী সাধনার একটা যোগ ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই সকল আত্মানুভূতির কথা খুলিয়া বলা যুক্তিযুক্ত নয়, তবুও এইটুকু বলি, যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর যখন ব্রাহ্মণীর নিকট শক্তিসাধনায় জীবনের সবখানি ঢালিয়া দিয়াছেন, কেশবকে তখন তই আমরা ব্রাহ্মসমাজের কাজে উদ্বুদ্ধ হইতে দেখি, ঠাকুরের স সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, চুম্বক আকর্ষণে লোহার মত এ দুই অপূর্ব্ব জীবনের মিলন, বাংলার অধ্যাত্ম ইতিহাসে এক অ কিক রহস্য। কেশবের পশ্চাতে কি মহাশক্তি অলক্ষ্যে থাকিয় তাহাকে জাতির ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তাহ নি নিজেই হয়তো বুঝিতেন না। কিন্তু তাঁহার এক একটী বাণী জও মানুষের প্রাণে শক্তির নির্ঝর উৎসরিত করে। কেশবের স্মৃতি বাঙ্গালীর মর্ম্মে গাঁথিয়া গিয়াছে।

অতীতের অধ্যাত্ম কীর্ত্তির পুনরুদ্ধারে রাজার জীবনপাত হইয়াছিল! মহর্ষিপ্রমুখ বহু মহৎপ্রাণ ব্রাহ্মের অক্লান্ত পরিশ্রমে সত্যের অনুভূতি মাত্র জাতীয় জীবনে স্পর্শ দিয়াছিল। ভাগবতানুভূতির মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, ইহজীবনে তাহার অমৃত আস্বাদ কেশবের জীবনে সুরু হইয়াছিল। ঠাকুরের সাধনায় তাহা মূর্ত্ত হইয়া জাতিকে ধন্য করিয়াছে। শতাব্দীর সাধনা দক্ষিণেশ্বরে পরিপূর্ণতার আনন্দে সমৃদ্ধ হইয়াছিল—সাধনার পূর্ণাহুতি এইখানেই সার্থক হইয়াছে—দক্ষিণেশ্বর তাই জাতির সিদ্ধতীর্থ।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মান্দোলনের আঘাতে প্রাচীন হিন্দুসমাজে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। পল্লীতে পল্লীতে হরিসভা, ভিতরে ভিতরে

গোপন তান্ত্রিকতা, সহজিয়া প্রভৃতি সাধন প্রভাব বাংলায় প্রকট হইয়া উঠে। ঠাকুর এই অসংখ্য সাধন পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য, কোলাহলময় কলিকাতা নগরীর কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনের দূরে থাকিয়া, একে একে সবগুলিকেই নিজের মধ্যে সংহরণ করিতে-ছিলেন, তাঁহার অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে ইহা সুস্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি যখন ধন্বন্তরির মত সুধাভাণ্ড হস্তে সিদ্ধি বিলাইতে ভক্তদের আকুল কণ্ঠে ডাক দিয়া তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন তিনি নিজেই বেলঘরিয়ার বাগানে গিয়া, কেশব যেখানে ঈশ্বরভক্তের ঝাঁক লইয়া আনন্দমগ্ন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে মার্জ্জিতবুদ্ধি, উচ্চশিক্ষিত নব্যবঙ্গ নিরক্ষর ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। "কেশবের লেজ খসিয়াছে," এই কথা শুনিয়া সকলে বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কেশব দিব্যদৃষ্টিবলে যখন এই মহাপুরুষের সত্য পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে প্রত্যয়পত্র পাইয়া, দলে দলে শিক্ষিত বাঙ্গালী ঠাকুরের চরণতলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, ঠাকুরের পরিচয় কলিকাতার বিদ্বৎসমাজে ছড়াইয়া পড়ে নাই। কেশবচন্দ্রই ইহার অগ্রদূত। নরেন্দ্র কেশবের মুখ হইতে ঠাকুরের অলৌকিক জীবন কাহিনী শুনিয়া, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া জীবন বিকাইয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও কেশবের সঙ্কেত ধরিয়া নবযুগের কেন্দ্রচক্রে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

এতদিন ধরিয়া গতানুগতিক জীবনধারার উপর আঘাত দিয়াই

জাতির চেতনাকে ঊর্দ্ধমুখী করার প্রচেষ্টা চলিতেছিল, চিন্তাজগতে তত্ত্বের তরঙ্গসৃষ্টি হইয়াছিল। সাধনা জীবনময় করার অধ্যাত্ম নির্দ্দেশ ঠাকুরে জীবন দিয়া সিদ্ধ হইল। তরুণ বাংলা কেশবের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রাণঢালা সাধনার পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কল্পতরু ঠাকুর প্রশস্ত রাজপথ দেখাইয়া দিলেন। কত হাজার হাজার লোক সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সে পথে চলিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে!

সে যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, যৌবনের জোয়ারে বিপন্ন, তরুণ বাঙ্গালী কিরূপ নিরাশ হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তপ্ত ঈশ্বর-বাণী সাময়িক ভাবে হৃদয়ে মধুর উত্তেজনার সৃষ্টি করে; কিন্তু চরম সান্ত্বনা দেয় না। ক্ষয়ে, অপচয়ে, ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি আল্‌গা হইয়া যাওয়ায়, বাঙ্গালী উৎসন্নের পথে বস্তুতঃ কোন সাহায্যই পাইতেছিল না। ঠাকুরের মুখেই ভরসার কথা প্রথম কাণে পৌঁছিল, হতাশ শুষ্ক হৃদয় উৎসাহে উল্লাসে জাগিয়া উঠিল, ঠাকুর বলিলেন, "এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস্‌ না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ টাঁধ মানে? .... কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়......একবার আধবার কথনও কুভাব এসে পড়ে তো, কেন এল বলে ভাবা কেন? ...... ওসব শৌচ প্রস্রাবের মত ...... শৌচ প্রস্রাবের চেষ্টা হয়েছিল বলে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাব্‌তে বসে?" কেশবের অনুতাপমন্ত্রে, পাপভারে হীন জীবনতরী বানচাল হইতে রক্ষার উপায় পাইত না। এই সময়ে এই আশার কথাটা অমৃতের মত উপাদেয় বোধ হইল।

তিনি শুধু ভরসা দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, "ঐ ভাবগুলি অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান কর্‌বি—মনে আর আন্‌বি না—খুব প্রার্থনা কর্‌বি, হরিনাম কর্‌বি—তাঁর কথাই ভাব্‌বি। ও-ভাবগুলি এল কি গেল, সেদিকে নজর দিবি না—ও-গুলা ক্রমে ক্রমে বাঁধ মান্‌বে।"

জীবনের গ্লানি ক্রমে ক্রমে দূর করার সুযুক্তি পাইয়া, নব্যবঙ্গ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। স্বভাবের অনিবার্য্য নিয়ম হইতে মুক্তি পাওয়ার কঠোর বিধি যেন সহজ হইয়া আসিল। ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে, এই নিত্য ব্যথার কথাটি এমন করিয়া শুনিতে পাওয়া সে যুগে সম্ভব ছিল না—এত ছোট কথা কে আর কহিবে? কিন্তু ঠাকুর খুঁটিনাটী জীবনের ভঙ্গীগুলি ধরিয়া, অধ্যাত্ম জীবন গঠনের যে সুনীতি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা ভবব্যাধি হইতে মুক্তির প্যানেসিয়া হইয়া উঠিল—দক্ষিণেশ্বরে মেলা বসিল—দলে দলে নারী পুরুষের গমনাগমনে, দক্ষিণেশ্বর মুখরিত হইয়া উঠিল।

তখন জীবনের রসে, ভাগবতারাধনার সহজ নীতি দুষ্প্রাপ্য ছিল। অক্ষর, অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরের আরাধনায় শান্তরসের উদয় হইত, হৃদয়ে তৃপ্তি মিলিত না। তুরীয় আস্বাদের ক্ষীণ আভাসে চক্ষে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত, ঠাকুর ভগবানকে জীবনময় করিলেন—সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি পঞ্চ-রসের উপাসনাকে নব প্রাণ দিয়া, সাধকের প্রাণে নূতন হিল্লোল তুলিলেন। ঈশ্বরদর্শনের পর, জীবাধার শাস্ত্রানুযায়ী সাধনে ও সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়ে সিদ্ধ করিতে তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ নিয়মিত ভাবে

সাধনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে, সাধনার সিদ্ধ নীতিটুকুই দিয়া গেলেন। জাতির অধ্যাত্ম জীবনপথ আজ তাই এমন সুগম হইয়াছে। তিনি ছয়মাস অদ্বৈতভাবে পূর্ণরূপে অবস্থিত থাকিয়াও, বহুজনহিতের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য, জাতির সুমহৎ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য জীবনের রাজ্যেই ফিরিয়াছিলেন। গিরিশের কর্ণে বকলমার সিদ্ধ মন্ত্র দিয়া, জাতিকে আত্মসমর্পণমন্ত্রে দীক্ষা দিবার অমোঘ বিধান তিনিই প্রবর্ত্তন করিলেন। আজিও যে তাঁহার অমিয়কণ্ঠের ঋক্ আমাদের কর্ণে অনাহত বাজে—"এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান; এই নে তোর ধর্ম্ম, এই নে তোর অধর্ম্ম; এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ, এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য, এই নে তোর যশ, এই নে তোর অযশ—আমায় শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি দে, দেখা দে—"

কে তখন গীতার আত্মসমর্পণযোগ বুঝিয়াছিল—কে তখন "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" মন্ত্রের মর্ম্মকথা এমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল? ঠাকুরের সাদা কথাগুলি, স্মরণের মাঝে আজিও কি পূত দৃশ্যের অবতারণা করে, তাহা তোমরা অন্তরের দিকে চাহিয়া একবার দেখিবে কি? সেই তোমারই মত মানবের আধার লইয়া, ভক্তি-উচ্ছ্বসিত, ছল ছল বিস্ফারিত চক্ষে ইষ্টমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি হৃদয়ের সকল প্রকার বাসনা কামনা পরিত্যাগ করার বৈরাগ্যপ্রদীপ্ত মূর্ত্তি, আত্মসমর্পণের দিব্যবিগ্রহ—বাঙ্গালী, সে শান্ত, উজ্জ্বল, ভাগবতপুরুষের চরণে অর্ঘ্যস্বরূপ হৃদয় ডালি দিয়া ধন্য হইবে কি?

যে সমাধি অধ্যাত্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—প্রতি ভূমির আধ্যাত্মিক অপূর্ব্ব দর্শন সাক্ষাৎ করিতে করিতে তিনি বেদান্তের সপ্তভূমিতে আরোহণ করিয়া যে নির্ব্বিকল্প সমাধি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি বহুজনের কল্যাণে ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সমাধির চেয়ে বড় জিনিষ—ত্যাগ, বিশ্বাস আর মনের বল।" জাতির প্রতি একি কম করুণার কথা! দুর্ব্বল, বিপন্ন জাতির পুনরুদ্ধারের সত্য প্রয়োজনটী এমন করিয়া অভ্রান্ত অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াই তিনি নিশ্চেষ্ট হন নাই, অভেদাত্ম নরেন্দ্রের এপথ চির রুদ্ধ রাখিয়া জাতির মধ্যে তাঁহার বিজয়ীশক্তির সঞ্চার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—আজ বাঙ্গালীর চরিত্রে যেটুকু ত্যাগ, বিশ্বাস, ও শক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়, ঠাকুরের অমর দানই যে ইহার মূলতত্ত্ব তাহা আর কে অস্বীকার করিবে!

ঠাকুরের বহুমুখী সাধনার কথা আলোচনা করার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, আর সে ক্ষেত্রও ইহা নহে—ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবতার চরণে সহজ ভাষায় অর্পণ করার প্রচেষ্টা, অস্ফুট বন্দনা-সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

রামমোহন, মহর্ষি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্য শ্রীভগবানের অনুভূতি-স্পর্শ লাভের সাধনায় অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সে যুগে কুসংস্কারে ও অজ্ঞান অন্ধকারে, দেশের হৃদয় মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায়, সত্য সামগ্রী অবিকৃতভাবে জীবন দিয়া গ্রহণের অধিকার হারাইয়াছিল। শুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিতে গিয়া, জাতির অশুদ্ধ আধারে আশ্রিত ভাল মন্দ সব

কিছুরই বিসর্জ্জন অনিবার্য্য হইয়াছিল; তাই, নব যুগারম্ভে, একটা নেতিমূলক নীতিকেই অধিক প্রশ্রয় দিতে দেখি। হিন্দুর আচরিত সকল অনুষ্ঠানের অন্ধকার দিকটা দেখাইয়া, খৃষ্টান মিশনারীদের মত জাতির প্রাচীন আচার পদ্ধতির উপর বিরাগসৃষ্টির আয়োজন ধর্ম্ম-সংস্কারকদিগের প্রধান কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইত—তখন ইহার প্রয়োজন ছিল। জাতির হৃদয়ে সত্যহীন নির্জ্জীব আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের আড়ম্বর এমনভাবে জাঁকিয়া বসিয়াছিল, যে সেখানে অধ্যাত্ম সাধনার সূক্ষ্মানুভূতিটুকু লাভের আর পরিসর ছিল না; কাজেই পুরাতন সমাজ ও ধর্ম্মসাধনার উপর হইতে আবর্জ্জনাস্তূপ সরাইতে গিয়া, ধর্ম্মের মূল ভিত্তি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছিল।

সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা না হওয়ায় হিন্দুধর্ম্মে ভাগবত সাধনার যে উদার সার্ব্বজনীন নীতি আছে, জ্ঞানে অজ্ঞানে তাহার সূত্র হারাইয়া যাইবার উপক্রম হইল। আত্মার উলঙ্গ সত্যটাকে আবিষ্কার করার যুগে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ঈশ্বরানুরাগের অনুভূতি পাওয়া মাত্র কেশবের হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইল। সে মকরন্দ লোভে বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্মানুভূতি মধুকরের মত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিতে লাগিল। মৃগনাভি-গন্ধে মত্ত হরিণের মতই কেশব উন্মাদ হইলেন, ধর্ম্মের বিচিত্র আস্বাদে তাঁহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিল। কখন তিনি দুর্গার উপাসনায় বিভোর হইলেন, কখন বা মহম্মদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ধ্বজা ধরিয়া, সঙ্কীর্ণ হিন্দু সমাজের প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টি করিলেন; আবার বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রভাব লাভে, ত্যাগ বৈরাগ্যের দীপ্ত

মূর্ত্তিতে গৈরিক বসনপরিধান করিয়া, স্বীয় পরিবারগণ্ডলীর মধ্যেই করপুট ভিক্ষায় অতীত যুগের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। নবদ্বীপ-চন্দ্রের অহেতুক রাগাত্মিকা ভক্তির পরশে তিনি মৃদঙ্গ বাজাইয়া কীর্ত্তন করিলেন, পবিত্র ও সংযমী আচার্য্যগণের চরণ বন্দনা করিয়া অতীত ভারত যে অবতারবাদের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, তাহার অনুষ্ঠানটুকুও কেশবের জীবনসাধনায় বাদ পড়িল না, যুগ-ধর্ম্মের জন্য তুরীয় ঈশ্বরতত্ত্ব যে ঘনীভূত আকারে রূপায়তনে ধরা দেন, এ রহস্য তাঁহার নিকট অবিদিত রহিল না। ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে কেশবের এইরূপ অত্যদ্ভুত আচরণে, তাঁহার সহতীর্থেরা চমৎকৃত হইয়াছিল; কিন্তু কেশবের জীবনে যে সময়ে ভারতের ও ভারতেতর অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মসাধনার অনুভূতি আভাসে খেলিয়া যাইতেছিল, ঠাকুর সেই সময়ে এই সকল সাধনার মূল বীজ লইয়া আত্মজীবনে সংহরণ করিতেছিলেন। যুগধর্ম্মের জন্য কেশবকে যে শক্তি আশ্রয় করিয়াছিল, ঠাকুর সে শক্তির মহাবিগ্রহমূর্ত্তি।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিছু দিন পরেই, ঠাকুর কালীমন্দিরের পৌরহিত্য গ্রহণ করেন। সে সময়ে, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে; এবং এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অতীতের প্রতি মমতাপরায়ণ হইয়াই গোঁড়া হিন্দুদল খণ্ডভাবে ইহার প্রতিকার সাধনে উদ্যত হইয়াছে; তখন ঠাকুর এই বিরোধের যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিলেন, তাহার উপর আর কাহারও কথা বলিবার কিছু থাকিল না। শশধর তর্কচূড়ামণি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া, যে প্রেরণার বেগ সামলাইতে

সমর্থ হইতেছিলেন না, ঠাকুরের কণ্ঠে প্রাণভরা মা মা ডাকে তাহা সিদ্ধ হইল—ইহা মনুষ্যের শক্তিতে সম্ভব, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

ঠাকুর একনিষ্ঠ পূজায় আত্মদান করিয়া, পাষাণের মধ্যে যে দিন চৈতন্যময়ী মহাশক্তির দর্শন পাইলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার সাধনার আরম্ভ—তাঁহার কথা "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল, কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি-কি? এক অসীম, অনন্ত, চেতন জ্যোতি-সমুদ্র!

সাধনার কোটায় এইরূপ সব বিচিত্র দর্শনের কথা সে যুগে তাঁর মুখেই প্রথম বাহির হইল। তিনি দেখিলেন ত্রিকোণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মযোনি, শ্রবণ করিলেন অনাহত বিচিত্র ধ্বনি—গঙ্গাগর্ভ হইতে অপরূপরূপসম্পন্না যুবতী-রূপে মহামায়া চক্ষের সমক্ষেই দেখাইলেন—সন্তান প্রসব করিয়া আবার তাহা লেলিহান রসনা বিস্তারে গ্রাস করিতেছেন। ঠাকুর উন্মাদ হইয়া উঠিলেন, সে রোগ ভবরোগ নয়, চিকিৎসায় আরাম হইবে কেন? পরিশেষে ব্রাহ্মণীবেশে সাধনশক্তি যথানিয়মে ঠাকুরকে সাধনার ক্রম পার করিয়া দিলেন; সে মহাবেদ রচনার ভাষা নাই। বাঙ্গালী, সাড়ে তিন হাত মানব আধারে কি অসাধারণ তপস্যা জাগ্রত বেশে জাতিকে ধর্ম্মসম্পদে সম্রাট করিয়াছে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিও!

ঠাকুর তো বাকী রাখিলেন না কিছু! চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সাধনা শেষ করিলেন, আমমাংসের আস্বাদ লইয়া ঘৃণার বন্ধন ঘুচাইলেন, ষোড়শী যুবতীকে কোলে লইয়া কাম জয় করিলেন,—বলিব কত?

মানব জীবনের যত কিছু জটিল সমস্যা, একে একে সব সমাধান করিলেন, তারপর রাগানুগা ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন—পুরুষ হইয়া প্রকৃতির সাধনায়—ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিব না। প্রস্তরময়ী মাতৃমূর্তির চরণতলে আত্মবিক্রয় করিয়া তিনি ভারতের শাস্ত্র জীবনে ফলাইলেন, সাধনার চরম করিয়া পরিশেষে বেদান্তের সিদ্ধ মূর্ত্তি তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—ভবিষ্য জাতির যে অধ্যাত্মভিত্তি তাহা ঠাকুরের করুণায় সিদ্ধ হইল। এ জাতির আর কি সাধনা আছে, সাধনার প্রবৃত্তি অহমিকার নামান্তর। জীবনের ভার ঐ দক্ষিণেশ্বরের ধূলি-রেণুর উপর নামাইয়া দাও, দেখ তুমি সিদ্ধ কর্ম্মী—তুমি অলস, স্থির বুদ্ধির অধিকারী—ভবিষ্য ভারত সাধনার ঘুরপাকে চুবান খাইবে না।

শুধু হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানই যে জীবন দিয়া আচরণ করিয়া সিদ্ধ হইলেন, তাহা নহে; ভারতের কঠিন সমস্যা, হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মবিরোধ—কেন জানি না, ঠাকুর সুফী গোবিন্দের নিকট মোসলেম মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া আল্লার পবিত্র নামের মর্য্যাদা রাখিলেন, তিন দিন তিনি যথানিয়মে নমাজ পড়িয়াছিলেন, মুসলমানের খাদ্য ভোজন করিয়াছিলেন, ঠাকুর হিন্দুজাতির তবুও তো কোহিনুর! আজ ভারতে ধর্ম্মের বিরোধ কেন? ধর্ম্মের প্রাচীর দুর্লঙ্ঘ্য করিয়া রাখার প্রয়োজন কি? দক্ষিণেশ্বরের মহিমা এ জাতি যে দিন উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে দিন ধর্ম্মের দেউল ভাঙ্গিয়া সমতল হইয়া যাইবে, ভারতে এক জাতি, এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা

হইবে। দক্ষিণেশ্বরে তাহার সূচনা হইয়াছে, ইহা ফলপ্রসূ করার ভার ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিতেছে।

শিক্ষিত সমাজে গুরুবাদের উপর একটা অকারণ অশ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়; অবশ্য গুরুকরণ যাহার তাহার ভাগ্যে ঘটে না, সংস্কারক্ষয়ের মত ইহা লৌকিক আচার নহে। উচ্চ অধ্যাত্ম ভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে, ইহার অনিবার্য্য প্রয়োজন আছে। এই গুরুশক্তির ঘনীভূত রূপই দিব্য জীবনের ভিত্তি। ঠাকুর এই গুরুবাদের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রসঙ্গে, পর-মনের (super-mind) সংবাদ দিয়াছেন। যে মনের ক্ষেত্রে পৌছিলে জাতি দিব্য হইবে, তাহার সঙ্কেত দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "গুরু ভাবটী শ্রীশ্রীজগদম্বা তার শক্তিবিশেষ ও সেই শক্তি সকল মানব মাত্রেই সুপ্ত বা ব্যক্তভাবে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই, গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক শেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যে তখন ঐ শক্তি তাঁহার নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মের জটিল নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তাহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকে।

শেষে মনই গুরু হয়, গুরুর কাজ করে, মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কাণে—আর জগদ্-গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। কিন্তু সে মন আর এ মনে অনেক প্রভেদ। সে সময়ে মন শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র হইয়া, ঈশ্বরের ঊর্দ্ধশক্তি প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়, আর এ সময়ে মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া ভোগসুখ ও কামক্রোধাদিতেই মাতিয়া থাকিতে চায়।" সোজা কথায় মানুষকে সে মনের কোটায় উঠাইয়া দিবার এমন সঙ্কেত আর কোথাও দেখা গেল না।

ঠাকুর ভবিষ্য জাতির সাধনপন্থার অব্যর্থ নির্দ্দেশ দিয়াছেন, কিন্তু সে পথে চলিবে কে? আমাদের কি মোহভঙ্গ হইয়াছে? জড়জীবনের ভোগে ক্লান্ত হইয়া আমরা মানস ভোগের যাদুঘরে বন্দী হইয়াছি—তিনি নিজের জীবনে যে ভঙ্গী দেখাইয়াছেন, একযুগ যদি সে ভঙ্গীর সাধনা করে, এবং ঠাকুরের সিদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, তবেই এদেশ বাঁচিবে, মুক্তির সন্ধান পাইবে। তিনি বলিয়াছেন—"বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার বিধি যেদিন হইতে নষ্ট হইয়াছে, ভারতের অধঃপতনের আরম্ভ তখন হইতেই সুরু হইয়াছে।" এই কথার মধ্যে, সাধনতৎপর নারীপুরুষের মধ্যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধানের যে অটল সঙ্কেত দিয়াছেন, তাহা কি আমরা পালন করিব না? ভবিষ্য জাতিকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য, একটা যুগ ঠাকুরের অনুসরণ করিয়া, ভবিষ্যতের প্রাণে অমৃতপ্রবাহ ঢালিয়া দিতে কি আমরা উদ্যত হইব না? আজ আর বাঙ্গালীর সাধনযুগ নাই, ঠাকুরের অমর সিদ্ধির উত্তরাধিকারী হইয়া আমাদের কণ্ঠে আকুল প্রশ্ন উঠুক—'ততঃকিম্' —তাহা হইলেই নবযুগের অমোঘ নির্দ্দেশ অগ্নিবর্ণে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে।

ঠাকুরের সন্ন্যাস, সেও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণের মহাশিক্ষা। জাতির কণ্ঠে এই ঋকই উচ্চারিত হউক—"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি, দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

আর এই নির্ব্বিকার চিত্ত লইয়া, ভারতের ঈশ্বরকোটী নারী

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পুরুষ. উঠ তোমরা, জাগ তোমরা, বহুজনহিতায় তোমাদের পবিত্র জীবনের আহুতিতে নূতন ভারত গড়িয়া উঠুক—বাংলার স্থল, জল. আর ব্যোম সুগম্ভীর নিনাদে প্রতিধ্বনি তুলুক—"হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

* * * *

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

—•—

একটা আলোকপিণ্ডের মত তারাবাজী আকাশের দিকে ছুটিতে ছুটিতে সহসা ফাটিয়া বিকীর্ণ আলোক ছড়াইয়া দেয়, রামমোহনের যুগ ঠিক এইরূপ একটা অখণ্ড, কূটস্থ সত্য, কালে শতধা বিভক্ত হইয়া জাতির বিগলিত ধর্ম্মে নূতন শক্তির সঞ্চার করে। কেশবের যুগে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ইহার পরিণত মূর্ত্তি দেখা যায়। আর আজ এই বহুমুখী সত্যপ্রেরণাসমূহের সঞ্চারে, অধ্যাত্ম সম্পদে বাঙ্গালী অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত কেশবের অধ্যাত্ম পরিচয়ের ফলে, দুইজন মহাপুরুষের আত্মপ্রকাশের পথ মুক্ত হয়—একজন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যজন বীরকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ। বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্মপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া সারা ভারতে পরিভ্রমণ করেন। তিনি এইসময়ে কেশবের "ভারত আশ্রমের" প্রধান

কর্ণধার ছিলেন এবং বিবেকানন্দ সমাজের একজন পরম উৎসাহী ও কীর্ত্তনের দলে প্রধান বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছিলেন। ঠাকুরের সংশ্রবে আসিয়া কেশবচন্দ্রের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিলে, এই দুই জনই ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বিশাল হিন্দুধর্ম্মের শক্তি বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের স্মৃতি কীর্ত্তন করিব।

বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের বংশে অবতীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁর সরল ঈশ্বরবিশ্বাস পূর্ব্বপুরুষগণের ধমনীধারার মধ্য দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিল। তিনি বাল্য-কালে গৃহদেবতা গৌরাঙ্গকে খেলার সঙ্গী করিবার জন্য আহ্বান করিতেন। এই পরম আস্তিক্য বুদ্ধি তাঁহার জন্মগত সম্পদ ছিল। তা'ছাড়া তিনি বাল্যকাল হইতেই অলৌকিক দর্শন ও শ্রবণ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের মহামারীতে তাঁহার সহ-পাঠিদের মধ্যে কেহ কেহ কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহাদের অদর্শনে তিনি শোকার্ত্ত হইয়া পড়েন। কথিত আছে, তিনি মৃত বালকদের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিতেন। তাঁহার পরিণত বয়সে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিয়া আমরা তাই বিস্ময়ান্বিত হই না।

বিজয়কৃষ্ণ বংশপ্রথানুগত বাল্যকাল হইতেই নৈষ্ঠিক ভক্তি-সাধনার অনুশীলন করিতেন; কিন্তু সংস্কৃত চর্চ্চা করিবার কালে তিনি বেদান্তে 'অহং ব্রহ্ম' অনুভূতি পাইয়া নৈষ্ঠিক সাধনা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বেদান্তের এই অহং-বুদ্ধি তাঁহার স্বভাবে খাপ

খাইল না। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তিনি যে পারিপার্শ্বিকতার ভিতর থাকিতেন সেখানে ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে এমন কুৎসিত অপবাদ প্রচার হইত, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হইয়া আর থাকা যায় না। কিন্তু বিধাতার অব্যর্থ বিধানে অবশেষে ঘটনাচক্রে তিনি বগুড়ায় কিশোরীলাল রায়ের ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব বুঝিলেন, এবং তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ঈশ্বরবিষয়ক মধুর উপদেশে তাঁহার হৃদয় দ্রব হইল। তিনি ব্রাহ্ম হইলেন।

বিজয়কৃষ্ণ যাহা প্রত্যয় করিতেন, তাহাতেই প্রাণ ঢালিয়া দিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ব্রাহ্মণের উপবীত রাখা কপটতা মনে করিলেন। এ বিষয়ে মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করায়, সদুত্তর পাইলেন না, মহর্ষি তখনও উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই, সমাজের আচার্য্যেরা সকলেই প্রায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ অন্তরে সান্ত্বনা না পাইয়া, উপবীত ছাড়িয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে এই উপবীত লইয়া প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কেশবচন্দ্র অনুকূলে থাকায়, আন্দোলন প্রবল মূর্ত্তি ধরিল; কিন্তু উপবীত ত্যাগ করায়, বিজয়কৃষ্ণের উপর শান্তিপুরে অত্যাচার যথেষ্ট হইল। তিনি যাহা সত্য বলিয়া ধরিতেন, তাহার রক্ষায় প্রাণ দিতেও কাতর হইতেন না, শান্তিপুরে নানা উপদ্রবের মধ্যে থাকিয়া সেই স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ছাড়িলেন। বিজয়কৃষ্ণের প্রচণ্ড তেজ ও উৎসাহে ব্রাহ্মসমাজ প্রবল হইয়া উঠিল। কেশবের পশ্চাতে বিজয়কৃষ্ণ না থাকিলে,

সে যুগে বিবিধ অন্তরায় উপেক্ষা করিয়া, ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ এতখানি বিস্তৃত হইত কিনা সন্দেহ।

আদি সমাজের সহিত বিরোধ করিয়া, কেশব ভারতীয় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠান্তে ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। কেশব বেদীতে বসিয়া, সে বিধি রাজবিধি নয়, পরন্তু ভাগবত বিধি, এইরূপ ঘোষণা করেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই, কুচবিহারের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া, সে বিধি নিজেই যখন ভাঙ্গিলেন, তখন বিজয়কৃষ্ণ কেশবের বিরুদ্ধে সিংহবিক্রমে প্রতিবাদের সুর তুলিলেন।

কেশবচন্দ্রের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে, বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেরূপে বুঝিয়াছিলেন, তাহার অনেক ব্যত্যয় হইতেছিল, কেশবকে অবতারবোধে পূজা প্রভৃতি বহুবিধ পৌরাণিক অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ এই সকলের বিরোধী ছিলেন, সুযোগ পাইয়া কেশবকে চাপিয়া ধরিলেন, তিনি বলেন, "আমি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য ইহা করিতেছি না, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য রক্ষা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মধর্ম্মীর কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের অপলাপ হইতেছে, ইহার প্রতিকার চাই।"

এই বিরোধের ফলে, নবগঠিত ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ ভাঙ্গিয়া বিখণ্ড হইয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ সমাজ গড়িয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে এইরূপ দলাদলির আবর্ত্তনে, তাঁহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি মোচড় খাইয়া বাহির হইয়া পড়ে; এই সময়

হইতেই তাঁহাকে সদ্‌গুরু দর্শনের আশায় আমরা দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখি।

তিনি প্রভূপাদ অদ্বৈতাচার্য্যের বংশরত্ন, কাজেই ব্রাহ্ম হইলেও খাঁটী বৈষ্ণব সাধুরা তাঁহাকে যোগ্য সম্মান দেখাইতেন। তিনি বরং ব্রাহ্ম হইয়াছেন বলিয়া, হিন্দু হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিতে যত্নপর হইতেন, কোন হিন্দুসাধু পাত্র করিয়া আহার্য্য প্রদান করিলে, বিনীত বচনে বলিতেন—"আপনারা জানেন না, আমি ব্রাহ্ম, হিন্দুসমাজের বাহিরে গিয়াছি"। তাঁর এইরূপ আন্তরিক কুণ্ঠা দেখিয়া সাধুরা অধিকতর সম্ভ্রম প্রদান করিত।

তৎকালে কালনার ভগবানদাস বাবাজী ও নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজীর নাম বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ ইঁহাদের নিকট যাতায়াত করিতেন, চৈতন্যদাস বাবাজী বিজয়কৃষ্ণের উক্ত প্রকার বিনয়বচন শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার কণ্ঠে তুলসীর মালা, মাথায় বিপুল জটাভার লক্ষ্য করিতেছি, কে বলিল আপনি ব্রাহ্ম!" গোস্বামী মহাশয়ের পরবর্ত্তী জীবনে এই ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইয়াছিল।

ব্রাহ্ম সমাজে যে আশায় তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে আশা-ভঙ্গে তিনি কাতর হইয়া পড়েন, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তিনি আত্মদর্শনের জন্য ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে গয়া তীর্থে, আকাশ গঙ্গাপাহাড়ে, মানস সরো-বরের পরমহংসের নিকট দীক্ষা লইয়া, পরম শান্তি লাভ করেন।

সাধক বিজয়কৃষ্ণের জীবন অলৌকিক রহস্যময়, সে সকল কথার

অবতারণা করিয়া লাভ নাই, জাতীয় জীবনে বিজয়কৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাই আমরা বুঝিতে চাই। পুরীধামে অবস্থান কালে, দুষ্টলোকে, মহাপ্রসাদের নামে তাঁহাকে বিষ প্রদান করে, তিনি তাহা বুঝিয়াই গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন—জীবনের এই একটী স্থূল ঘটনা ধরিয়াই, তাঁর জীবনভোর সাধনার মর্ম্মতত্ব আমরা অবগত হই।

বিজয়কৃষ্ণ দীক্ষান্তে পুনরায় পরিত্যক্ত উপবীত গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন নাই তিনি পূর্ব্বে যে ভাব প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেন, এই সময় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে গুরুবাদের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, স্বয়ং সেই গুরুবাদ প্রচার করিলেন ব্রাহ্মদের যোগ দীক্ষা দিয়া—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গোঁড়া ভক্তগণ এ অত্যাচার সহিলেন না, বিজয়কে সমাজ হইতে ছাড়াইয়া দিলেন। গোস্বামী মহাশয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া, বিশাল হিন্দু সমাজে আত্মদান করিলেন, তাঁর এই অমর আত্মদানে হিন্দু ধর্ম্মে কর্ম্মে অনুষ্ঠানে নূতন প্রাণ পাইল, শান্তিপুরের ধুলোটে গোস্বামীজার দিব্য উন্মাদের যে লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া হিন্দু সমাজ আবার তাঁহাকে বুকে করিয়া গ্রহণ করিল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলেন। নীলকণ্ঠের মত, যে পাশ্চাত্য প্রভাব হিন্দু সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল সে উগ্র বিষ কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক বিজয়কৃষ্ণ উপেক্ষিত বৈষ্ণব ও তন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বাঙ্গালী জাতির

সুপ্ত অধ্যাত্ম গৌরব পুনঃ জাগরিত করিলেন। কালের আবর্ত্তনে, ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইলে. সে গ্লানি দূর করার নীতি, দূরে দূরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা নয়, কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দিয়াই সে বিষধর সর্পের দর্প চূর্ণ করা। বিজয়কৃষ্ণের, জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মের আচরণ ও তৎপরে ভারতের পরম সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া সনাতন ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি মানসে আত্মদান, এইরূপ চমৎকার নীতিরই জলন্ত নিদর্শন।

বাঙ্গালীর সাধনতত্ত্ব শাস্ত্রনিবদ্ধ নয়, প্রত্যক্ষ জীবন লইয়া ইহার বিগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে, বিজয়কৃষ্ণ এইরূপ জীবন্ত সাধন-তত্ত্বের একটি পরিপূর্ণ বিগ্রহ। যেমন কুরুক্ষেত্রের মত মহাসঙ্কট কেবল যে জ্ঞাতিবিরোধ হেতু ঘটিয়াছিল তাহা নহে, উহার পশ্চাতে যে সূক্ষ্ম কারণ, তাহা ভাগবত ধর্ম্মকে জাগ্রত করিয়া ধরা, তদ্রূপ বাংলায় চৈতন্য যুগ হইতে যে মহাকুরুক্ষেত্র চলিয়াছে. তাহার ভিতর দিয়া এই ভাগবত চরিত্রকেই রূপে রসে ফলাইয়া ধরার প্রয়াস চলিয়া আসিয়াছে। এই প্রয়াসের ক্ষেত্রে যাঁহাদের জাগ্রত চরিত্র ফুটিয়া উঠে, তাঁহাদেরই আমরা যুগপুরুষ বলিয়া পূজা করি, শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণের জীবনে এ রহস্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম জীবনে তিনি অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিতে গিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বকে অবধারণ করিয়াছেন, তারপর তাঁর সিদ্ধ যোগ দীক্ষায় আত্মায় পরমাত্মায় যোগ স্থাপনের সঙ্কেত ফুটিয়া উঠে, তারপর তাঁর জীবনে লীলারস উথলিয়া উঠে, ইহাই ভগবান্-তত্ত্ব। বাঙ্গালী ব্রহ্ম চাহে না, পরমাত্মা চাহে না, চাহে

ভগবান, সাধনার ইহাই চরম সিদ্ধি, বিজয়কৃষ্ণ বাঙ্গালীকে সে পথের সন্ধান দিয়াছেন, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-গরল গলাধঃকরণ করিয়া বাঙ্গালীকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দান করিয়াছেন, এইজন্য মৃত্যুশয্যায় মহর্ষি বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন :—"জ্ঞান কেবল কথার কথা, প্রেমভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। তাহা তো আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁরই দয়ায় হয়। 'পুরুষকার' অর্থশূন্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার।" বাংলায় নানাদিক দিয়া যে যুগধর্ম্মের সাহায্যে, ভগবানে আত্মোৎসর্গ করিয়া এ জাতি ধন্য হইবে, তাহার ব্যবস্থা দিতেই যুগ-পুরুষগণের আবির্ভাব, বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বাণী—"The truth of the future which Bijoy Goswami hid within himself has not been revealed." গোস্বামীর নিজ মুখেই এই কথার মূল সূত্র বাহির হইয়াছিল, "আমার এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা এই স্থূল দেহ বর্ত্তমান থাকিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যথাসময়ে এই কার্য্য আরম্ভ হইবে।" সে কাজ বাঙ্গালী কি আজও আরম্ভ করিয়াছে?

* * * *

স্বামী বিবেকানন্দ

—০—

জাগরণের লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের সহিত সংঘর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ঘটনা—এই কাল ব্রাহ্মসমাজের যুগ বলা

স্বামী বিবেকানন্দ

যাইতে পারে। রামমোহনের যুগ প্রকৃতই সংঘর্ষের যুগ। এই যুগে সত্যশক্তির স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা সম্ভব ছিল না। কেশবচন্দ্র নির্ম্মাণের খনিত্র হস্তে জাতিকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নির্ম্মাণের আদর্শ নিখুঁত ভারতীয় না হওয়ায় তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়ার আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইয়া, যে বিষ জাতির বৈশিষ্ট্য লোপের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া ভবিষ্য জাতির কর্ম্মপন্থা নিরাপদ করিলেন। সত্যদৃষ্টির অমোঘ বীর্য্য দক্ষিণেশ্বর হইতেই জাতিজীবনে সঞ্চারিত হইল। তাই নরেন্দ্রের জীবন গোস্বামীর মত প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণিপাকে কোথাও মথিত হয় নাই। ঋজুগতিতে হিন্দুশক্তির বৈশিষ্ট্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া জাতিকে অমৃতত্বের পথ দেখাইয়া দিল।

ব্রাহ্মযুগ নবযুগের স্বর্ণ উষা। যুগপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ ও নরেন্দ্র উভয়েই এই তরুণ আলোকে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কেশব-চন্দ্রের ভিতর দিয়া ভবিষ্য ভারতের জন্য যে বিদ্যুৎশক্তি প্রকাশ হইতেছিল তাহা প্রথমে উভয়েরই চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছিল, কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রতীচ্যের ধর্ম্ম, সমাজ, আচার অনুষ্ঠান নূতন ঢঙে ঢালাই করিতে গিয়া কেশবচন্দ্র একটা খিচুড়ী পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন। যুগধর্ম্মের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহা আজও বলা যায় না। অন্ততঃ সে যুগে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ দেশের কাছে বৈদেশিক আদর্শ বলিয়া ঠেকিতেছিল। গোঁড়া হিন্দুদের পুরাতনকে আঁকড়িয়া ধরায় আসক্তিমূলক যে

প্রতিক্রিয়া-শক্তি, সে শক্তি এই নূতন প্রবাহের মুখে বাঁধ তুলিতে পারে নাই, কিন্তু এই সংঘর্ষের ফলে হিন্দুসত্তার জাগরণ ঘটিল, এবং বিচিত্র বিধানে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই শনৈঃ শনৈঃ হিন্দুশক্তি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল।

শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তরুণের মনে হিন্দুর প্রাচীন আচার আচরণের উপর শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিল। বৈদেশিক অলকট ব্লাভাটস্কির থিওসফি হিন্দুত্বের মহত্ত্ব প্রচার করিয়া, হিন্দু জাতিকে অন্তর্মুখী করার দিকে কিছু সাহায্য করিল। তার উপর সিদ্ধ জীবন লইয়া, প্রেম ভক্তির মূর্ত্ত দেবতা বিজয়কৃষ্ণ যখন উদাত্ত কণ্ঠে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাগবত তত্ত্ব ও গুরুবাদের ভিতর দিয়া, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিলেন, তখন ব্রাহ্ম সমাজ কাণা হইয়া গেল। যাহা ভাঙ্গিতে অর্দ্ধ শতাব্দী লাগিয়াছিল, তাহা নূতন আকারে সমধিক শক্তি ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করিল। তারপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মিশ্রিত জীবনের রসায়নে, বাঙ্গালীর জীবনে সাধনার রস উৎস উথলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে বঙ্কিম, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির গীতার যুক্তিযুক্ত জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগের সামঞ্জস্য আনয়ন চেষ্টা, বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল, বাংলার হিন্দু ব্রাহ্মসমাজের সাধু প্রয়াস পরিপাক করিয়া বাংলার বৈশিষ্ট্যকেই মাথায় করিয়া ধরিল। বাংলার এই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে। নরেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের ভিতর দিয়া যে নব-শক্তির পরশ পাইতেছিলেন, তাহা আত্মজীবনের সিদ্ধ জাতীয়তার

ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া খাঁটি ভারতীয় ভাবটিকেই ধরিতেছিলেন, কেশবের মুখে যখন প্রাচীন সিদ্ধ পুরুষগণের অনুভূতি-স্পর্শ অগ্নিময়ী ভাষায় নির্গত হইত, নরেন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি তখন হিন্দু দেবদেবীর ভিতরেও যে সূক্ষ্ম তত্ব নিহিত আছে, তাহার সূত্র যেন খুঁজিয়া পাইত, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট হইয়া উঠিত না, এই অবস্থায় ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে তিনটী বড় গুণ ছিল, আচার্য্যের চরণে আন্তরিক আনুগত্য স্বীকারে কুণ্ঠাহীনতা, দ্বিতীয় সূক্ষ্ম অর্ন্তভেদী দৃষ্টি, তৃতীয় জীবনের সবখানি দিয়া ভাবানুভূতির শক্তি। ঠাকুরের সহিত তাঁর প্রথম সাক্ষাতের সময়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের ভবিষ্যৎ তাঁর মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সাহায্যে কতকটা নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যে অমৃত অনুভূতির মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিলে, জাতীয় জীবনে আত্ম-শক্তির বিকাশে বিদ্যুৎশক্তির সঞ্চার করিতে পারা যায়,সেই অমৃতের সন্ধানে তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র একদিন তাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া আকুল কণ্ঠে ভগবানের সন্ধান চাহিয়াছিলেন, উত্তরে পরিতৃপ্ত না হইয়া, আত্মীয়ের কথায় দক্ষিণেশ্বরের উন্মাদ সাধুর উদ্দেশ্যে তথায় গিয়া উপস্থিত হন, যে অনুভূতির পরশের অভাবে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, বিধাতার আশীর্ব্বাদে তিনি সে পরশমণির সন্ধান পাইলেন। স্বামীজি নিজেকে ঠাকুরের চরণে বিনামূল্যে বিকাইয়া দিলেন। জাতির অধ্যাত্ম ইতিহাসে ইহা একটী স্মরণীয় দিন।

নরেন্দ্রনাথ সে যুগের শিক্ষিতসমাজের প্রতিভূ ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ অর্ব্বাচীন যুগের জ্ঞানগরিমাহীন অকিঞ্চন ব্রাহ্মণের চরণে আত্মদান করায়, শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতির দীক্ষা হইল. পরবর্ত্তী যুগে ধর্ম্ম আর আবর্ত্ত রহিল না, শান্ত জাহ্নবীধারার মত ছন্দময় জীবনে অধ্যাত্ম সাধনার অমর প্রভাব সঞ্চারিত হইয়া. বাঙ্গালী জাতিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। স্বামীজি প্রদীপ্ত বহ্নির মত, এই সাতকোটী বাঙ্গালীর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া যে আলো দেখাইলেন, সহস্র বৎসরের অন্ধচক্ষু সহসা উন্মিলিত হইল, নব জীবনের উল্লাসে বাংলার নবযুগ কি বিচিত্র মূর্ত্তিতে বিশ্বের চক্ষে চমক লাগাইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে।

স্বামীজীর সম্বন্ধে তরুণ বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে চিন্তার তরঙ্গ আজও থামে নাই, সে সকল স্বাধীন চিন্তাস্রোতে নূতন কিছু দিবার নাই। তাঁর অমর কণ্ঠ অনাহতধ্বনি তুলিয়া বাঙ্গালী জাতিকে আজও সজীব রাখিয়াছে, তাঁর সরল বীর্য্যবান সাহিত্যের অনুশীলনে তরুণ জাতি আত্মগঠনের যথেষ্ট খোরাক পাইতেছে, স্বামীজীর স্মৃতি আমাদের নিকট আজও মূর্ত্তিমান, অতএব ইহার সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই।

স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বর, জীবের ধর্ম্ম এই দিব্য জীবনকে জাগ্রত করিয়া তোলা। তাঁর সংশয়াত্মক চিত্ত ঠাকুরের চরণে সহজে বিকায় নাই, জ্ঞানের সীমা হারাইয়া তিনি যখন বিপন্ন, তখন ঠাকুর অশেষ করুণায়, সন্তানকে কোলে টানিয়া

দেখাইলেন জীবে চৈতন্যে ভেদ নাই, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, পৌরুষেয়, অপৌরুষেয় প্রভৃতি কথার প্যাঁচে আমরা মজিয়াছি—পঞ্চবটীর মূলে, ভাবমুখে কালী ব্রহ্মের মিলনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া নরেন্দ্রের মধ্যে সঞ্চিত তপঃশক্তি ঢালিয়া দিলেন, স্বামীজী বলেন:—
"From the time in which he made me over to the Mother, he retained his vigour of health for only six months. The rest of the time he suffered."

ঠাকুরের প্রয়োজন শেষ হইয়াছিল। তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রয়ান করিলেন। ঠাকুরের প্রদত্ত বীর্য্য ও তপস্যা জীবনময় করিবার জন্য, নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ সাধনা করিতে হইয়াছিল, ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে প্রব্রজ্যা-বেশে ভ্রমণ করিয়া ভারতের সত্যকে মর্ম্ম দিয়া উপলব্ধি করিলেন, তারপর পাশ্চাত্যের ধর্ম্মবেদীতে দাঁড়াইয়া ভারতের সত্য প্রকাশ করিলেন, বিশ্ব চমকিত হইয়া গেল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি মাত্র পাঁচটী বৎসর, জাতির প্রাণে তাঁর অমর বীর্য্য প্রদানের অবকাশ পাইয়াছিলেন, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী জাতিকে অধ্যাত্ম সাধনার সিদ্ধপথে উঠাইয়া তাঁর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তার পর হইতেই বাংলায়—শুধু ধর্ম্মজীবনে নয়, জাতির রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষায়, সর্ব্বক্ষেত্রে নূতনের বান ডাকিয়াছে। স্বামীজীর অন্তর্দ্ধানের পর বাঙ্গালী এক নিমিষের জন্য চক্ষু মুদিয়া বসিবার অবকাশ পায় নাই। শক্তির তরঙ্গ আসিয়া তন্দ্রাতুর জাতিকে চির জাগ্রত রাখিয়াছে।

* * * *

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

—•—

বিগত শতাব্দীর ধর্ম্মসিন্ধু মন্থন করিয়া যে অমৃত উত্থিত হইল, স্বামীজী স্বহস্তে তাহা জাতিকে বিলাইয়া গিয়াছেন। ভীরু বাঙ্গালী তাই আজ মরণভীতি পায়ে চাপিয়া নবযুগের অগ্নিহোত্রী রূপে গর্ব্বোন্নত শিরে অন্তরে বাহিরে মুক্তির সন্ধানে ছুটিয়াছে। স্বামীজীর তিরোধানের পরেই আর একজন যুগপুরুষ বিদ্যুৎ-বিকাশের মত বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া জাতিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁর অমোঘ বীর্য্য নিখুঁৎ পরিপূর্ণতার শক্তিতে দীপ্তিময়। জাতীয় জাগরণের মূলে এই যুগপুরুষের আত্মদান ভবিষ্যতের আশা ও আদর্শ সুস্পষ্টীকৃত করিয়াছে—ইনিই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

বাঙ্গালী জাতির জাগরণ সংবাদ পাইয়াই এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ স্বীয় অদৃষ্টের মোড় ফিরাইয়া, নবোত্থিত উত্তেজনাচঞ্চল জাতির জীবনগতির নিয়ামক হইলেন। তাঁহার নিপুণ নেতৃত্বের কৌশলে অজ্ঞাতসারেই দেখিতে দেখিতে এই বিশাল জাতির কর্ম্মজীবন অধ্যাত্মপ্রভাবময় হইয়া পড়িল। রাষ্ট্র-সাধনার উত্তেজনাময় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে জাতিকে অধ্যাত্ম শক্তি আহরণ করাইলেন, স্বামীজীর নিছক অধ্যাত্ম জাতীয়তার উপর কঠোর রাষ্ট্রনীতির সংমিশ্রণ ঘটাইলেন, ধর্ম্মের সহিত বস্তুতন্ত্র জাতীয়তায় অনিবার্য্য রাষ্ট্রসাধনা সংযুক্ত হওয়ায় বর্ত্তমান জাতীয় জীবন সমধিক

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইল, জীবনে শক্তির জোয়ার বহিল, জীবননীতির প্রতি ভঙ্গীতে ধর্ম্মের দ্যোতনা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তরুণ বাঙ্গালী ধর্ম্মের আস্বাদ অনুভব করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল না, ধর্ম্মকে জীবনময় করিয়া লইবার পথ পাইল।

নব জাগ্রত জীবনের উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য প্রকাশের যুগ কালে একটু স্থির হইয়া আসিলে, নবযুগের ঋষি দিব্য জাতীয়তার উৎসমূল মুক্ত করিয়া দিলেন, সে মন্দাকিনী ধারায় বাঙ্গালী স্নিগ্ধ হইল, উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের প্রশমনে জাতি অন্তর্মুখী হইল, বাঙ্গালায় সে অমর জাতীয়তা আজও কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাঁর নিক্ষিপ্ত বীর্য্য অব্যর্থ ফল প্রসব করিবে, বাংলায় সে যুগ আসিবে—বাঙ্গালী তাহারই অপেক্ষায় দিন গুণিতেছে।

তিনি জলদ গর্জ্জনে বলিলেন—"The religion of India is nothing if it is not lived." তিনি শুনাইলেন—বিশ্বের জন্য ভারতের মুক্তি, ঐক্য ও মহত্ত্বের প্রয়োজন হইয়াছে। জাতিকে আত্মস্বার্থের বাঁধন হইতে মুক্তি দিয়া ভূমার লক্ষ্যে ছুটাইলেন।

জাত জাগিল নিজেদের জন্য নয়, বিশ্বের জন্য। হিন্দুধর্ম্ম প্রবুদ্ধ হইল, হিন্দুত্বের জন্য নয়, তিনি বলিলেন—"In this Hinduism we find the basis of the future world-religion." তিনি অনাহত বীণাধ্বনি করিয়া গাহিলেন—"Our aim will therefore be to help in building up India for the sake of humanity—this is the spirit of Nationalism which we profess and follow."

জাতীয়তা সাধনার ক্ষেত্রে বৃহতের সন্ধান পাইয়া বাংলার অধ্যাত্মস্রোত এই দিকে মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইল, সেই যে জাতি নবপ্রেরণা-বলে সঞ্জীবনী শক্তির সন্ধান পাইয়াছে—আজও তাহা হ্রাস হয় নাই; বুঝি এ অমর জাতীয়তা পূর্ণ সার্থকতা না পাইয়া আর মোড় ফিরিবে না। আজ শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় নাই, তাঁর অমর শক্তি জাতকে ছুটাইতেছে, ছেদহীন গতি লক্ষ্যে না পৌঁছিয়া ইহা আর রুদ্ধ হইবার নয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে বাংলার জাতীয় জীবনের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের এক প্রান্তে নীরবে আত্মসাধনায় সমাহিত। এই চতুর্দ্দশ বৎসর যে অলক্ষ্য শক্তি জাতিকে এত দূরে আনিয়াছে, কালের আবর্ত্তনে সে মহাশক্তি মূর্ত্তি লইয়া জাতির পুরোভাগে কবে দাঁড়াইবে কে জানে।

* * * *

স্বদেশীযুগের স্মৃতি

—:*:—

(১)

পরাধীনতার বেদনা স্বাভাবিক। এই বেদনার অভিব্যক্তি নানা কারণযোগে প্রকাশ হইয়া পড়ে। "নিজবাসভূমে পরবাসী" হওয়ার ব্যথা অনুভবের মধ্যে জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের স্পৃহাও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বিশেষ বাঙ্গালীর মনে পলাশীর স্মৃতি ঘুচিবার নয়। সেদিন সে যে সাধ করিয়া গলায় ফাঁস তুলিয়া লইয়াছে। কি লজ্জার কথা! ব্যথার চেয়ে এই লজ্জা নাকি বাঙ্গালীর জীবনে প্রথমে বড় ধিক্কার তোলে। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?" —এ গানে ধিক্কারের সুর যতখানি, বেদনার অনুভূতি তত তীক্ষ্ণ নহে।

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

কবি হেমচন্দ্র যখন এই কথা লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁর মনেও আত্মধিকারের ভাব বিশেষরূপে ফুটিয়াছিল। যে পরাধীন, তুলনায়

সে কত হীন! সেই হীনের হীন আমরা—ছিঃ, আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি? তাই স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়? তাই পায়ের বেড়ী, দাসত্বের শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলার সাধ জাগে! এমন সাধ বুকে ভরিয়া, বাংলার স্বাধীনতা-চেষ্টার সূত্রপাত। ব্যথাটা অনেকটা মনের, প্রাণের তীব্র জ্বালা, মর্ম্মের সাক্ষাৎ পীড়ণ অনুভূতি তখনও জন্মে নাই। এই ভাব লইয়াই আরম্ভ।

(২)

"জাতীয়তার দাদামহাশয়" ৺রাজনারায়ণ বাবুই নাকি শুনিতে পাই সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীনতার প্রেরণাটীকে গোপন অন্তরে পোষণ করিয়া, একটা ষড়যন্ত্র সমিতির সূত্রপাত করেন। ব্যাপারটী ঠাকুরগোষ্ঠীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, সে যুগে এ দিক দিয়া কাজটী বাহিরে আর বড় আগায় নাই। 'উত্থায় লীয়ন্তে' গোছের কতকটা সখের প্রেরণা ইঁহাদের ভাবের মধ্যে খেলিয়াই তখনকার মত শেষ হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর রক্তধারার মধ্যে এই আবাহন রহিয়া যাইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। রাজনারায়ণবাবু হিন্দু-মেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়াও প্রকাশ্য ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবের প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ সাহিত্যমণ্ডলের মহারথগণ সম্বন্ধেও এরূপ একটা প্রবাদের আভাষ যেন কোথায় শুনিয়াছিলাম। তবে এতদ্‌সম্বন্ধে বিশ্বাস্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। একটা কথা হয়ত সত্য হইতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্রী

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মেসন' (Free mason) নামক সঙ্ঘ-পন্থার সহিত পরিচিত ছিলেন—এই ভাবের প্রভাব তাঁর "আনন্দ মঠের" পট-কল্পনায় হয়ত কিছু সাহায্য করিয়া থাকিতে পারে। কথাটার সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে এখানে যাচাই করিয়া ঠিক কিছুই বলিতে পারিলাম না। উহা আদৌ সত্য নাও হইতে পারে।

যুগমন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্" গান রচনা করেন, সে স্বদেশীযুগের প্রায় পঁচিশ বৎসর আগের কথা। তখনও 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসখানি রচনার পরিকল্পনা তাঁর মনে জাগে নাই, একটা অন্তর্মুখ প্রেরণার অবস্থায় তিনি যখন গানটি রচিত করিয়া তাহাতে সুরসংযোগ করিতেছিলেন, তখন "বঙ্গদর্শনের" কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে গানের পরিবর্ত্তে উপন্যাস রচনা করিতেই বলেন—গানে "বঙ্গ-দর্শনের" ক্ষুধা মিটিবে না। শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-ছিলেন,—"যদি পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়া থাক, তবে তখন এ গানের মর্ম্ম বুঝিবে।" পঞ্চবিংশ পরে বাঙ্গালী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মন্ত্রেই দীক্ষা লইয়া স্বদেশ-প্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল। সেই মন্ত্রেই স্বদেশীযুগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

(৩)

কতকটা হিন্দুমেলার স্মৃতি ধরিয়াই মনে হয় অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালে, শ্রীমতী সরলাদেবী "বীরাষ্টমী" ব্রতোৎসবের প্রকল্পনা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে তিলকের 'গাণপত' ও 'শিবাজী' উৎসবও এই ধরণের। ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়

সম্ভবতঃ ১৯০২ সালে মারাঠার বীরপূজা বাংলাদেশে প্রবর্তিত করিয়া, মারাঠী ও বাঙ্গালীর মধ্যে একজাতীয়তাসূত্রে সখ্যসম্বন্ধ দৃঢ়তর করেন। তদবধি মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় 'শিবাজী' উৎসবের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। রবিবাবুর সুবিখ্যাত কবিতা "শিবাজী" এই উৎসব উপলক্ষেই বিরচিত হয়--স্বদেশীয় বীরের পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশে বড় করুণ সুন্দর কবিহৃদয়ের সেই তর্পণাঞ্জলি। জাতীয়তার মনীষী বিপিনচন্দ্রও সেদিন সোৎসাহে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

এইকালে জাপান হইতে মনীষী ওকাকুরা আসেন। জাতীয়তার উদ্বোধনকল্পে তাঁহার আগমনে যথেষ্ট আশা ও উৎসাহ সংযোগ হয়। ওকাকুরার স্বাধীনতার বাণী ইঁহাদের প্রাণে যে উদ্দীপনা ও তেজঃ সঞ্চার করে, তাহা ধূমায়মান স্বাদেশিকতার বহ্নিকে জাগাইয়া জাতীয় শিল্পকলা ও গূঢ় রাষ্ট্রীয়চর্চার নূতন ভঙ্গীকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কলা-গুরু অবনীন্দ্রনাথের কল্প-প্রতিভা তখন ভারতীয় শিল্প-সাধনায় নবযুগের জন্মদানে ব্যস্ত ছিল। ওকাকুরা এশিয়ার যুগপ্রেরণাকে সার্থক করিতে, জাপানের সঙ্গে প্রাচ্য সভ্যতার কোহিনুর ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান কত প্রয়োজনীয় তাহা অনুভব করিয়াছিলেন ও সেই অনুভূতির সঞ্চার ইঁহাদের মধ্যে করিতেন। জাপানের আদর্শে ভারতের রাষ্ট্র-জাগরণ স্বপ্ন হইতে বাস্তবে নামে, ইহা তাঁহার অন্তরের কামনা ছিল ও ইহার জন্য সকল রকম পরামর্শ দিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। স্বদেশীযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালী এরূপ কত স্বপ্নের

রঙীন নেশায় বিভোর ছিল তার ঠিকানা নাই। শুনা যায়, একবার লর্ড কার্জ্জনের জীবননাশের পর্য্যন্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা হইয়াছিল। ইহাও স্বদেশীযুগের আগে। রাম না জন্মিতে রামায়ণের ন্যায়, আরও যে সব ভাব ও প্রস্তুতি ফল্গুপ্রবাহের মত ভিতরে ভিতরে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার সকল কথা হয়ত এখানে খুলিয়া বলা চলে না। বারীন্দ্রকুমারের দল "ভবানী মন্দিরের" ছক প্রচার করিয়া ইতিপূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী শুনিয়াছি, একটা ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ ছিল, যে ১৯০৫ সালে বাঙ্গলায় নূতন শক্তি অবতরণ করিবে, কিন্তু প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইবে ১৯০৭ সালের পরে। মধ্যপ্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ নেতা সেন্সাস গণিয়া দেখিয়াছিলেন, একটা বিশেষ সালে, বিশেষ লগ্নে জন্মিয়াছেন, এক ঝাঁক তরুণ, যাহাদের ভাগ্য-কোষ্ঠী জানাইয়া দেয়, তারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিবে। এমন সব কথার প্রচার ভাবোপজীবি মনের পক্ষে একটা নূতন ধরণের নেশার খোরাক যোগায় সন্দেহ নাই। কিন্তু আসল কর্ম্মী একদল খনিত্র হস্তে যথার্থই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে নামিয়া গিয়াছিল—স্বাধীনতার প্রেরণা ইহাদের কাছে আর শুধু মনের সখ ছিল না, স্বপ্নকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণ-ঢালা বিশ্বাস ও একাগ্রতা লইয়া ইহারা নামিয়াছিল—বাংলায় ভোরের আলো দেখা দিবার পূর্ব্বে এরূপ অসমসাহসী তরুণ তীর্থ-যাত্রী মুক্তির সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের সাধনায় আন্তরিকতা ছিল। সে প্রসঙ্গ আমরা স্থানান্তরে অবতারণা করিয়াছি। স্বদেশীযুগের

পূর্ব্বস্রোত ইহারাই একদিক্‌ দিয়া খাত কাটিয়া বুকে করিয়া বহাইতেছিলেন, তাই এক্ষেত্রে তাহার উল্লেখ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল।

(৪)

সিষ্টার নিবেদিতা এ যুগে একটি প্রেরণা-মূর্ত্তি ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রেরণাময়ী মানস-কন্যা বিদ্যুল্লতিকার ন্যায় কলিকাতার তরুণমহলে উদ্দীপনাময় ভাব-জীবনের গঠন করিয়া তুলিতেছিলেন, স্বদেশীযুগের ভাবোদ্বোধনে তাঁহার জীবনদান অনেকখানি। এই নীরব কর্ম্মময়ী আত্মশূন্যা বীরসাধিকা স্বয়ং ভারত-ধ্যানে ভাববিভোরা ও সেই জাতীয়তার বিমল ভাবই অনুক্ষণ যুবকহৃদয়ে সংক্রামিত করিতেন। কলিকাতায় "ডন-সোসাইটী" (Dawn Society) বলিয়া যে জাতীয়তা-অনুশীলনের চিন্তাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উদ্যোক্তৃগণ নিবেদিতার জ্বালাময়ী উৎসাহ-প্রেরণার আধার হইয়াছিলেন। পরে ইঁহারা সমিতি হইতে উক্ত "Dawn" নামেই ইংরাজী মাসিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

সিষ্টার নিবেদিতা নির্ভীক চিত্তে "বীর্য্যময়ী স্বাদেশীকতা"ই প্রচার করিতেন। টাউনহলে তাঁর অনলময়ী ভাষায় "Dynamic Religion" সম্বন্ধে বক্তৃতা যুবক-প্রাণে অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার বিদ্যুত্তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল। মন্ত্রমুগ্ধবৎ তরুণ শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে এই কথাই অনুবিদ্ধ হইয়াছিল—"No more words—words—words. Let us have deeds—deeds

সিষ্টার নিবেদিতা।

deeds." আর শুধু কথা—কথা—কথা নয়; এবার চাই কাজ—কাজ—কাজ"—বাংলার তরুণ তাঁর এ অগ্নিময়ী চাওয়া অচিরে সফল করিয়াছিল।

শুধু যুবকদলে আদর্শ দেওয়া নয়, সিষ্টার নিবেদিতা চিন্ময়ী অগ্নিশিখার ন্যায় ঘরে ঘরে গিয়া স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমের আগুন জ্বালাইতেন—রাজা, মহারাজা প্রভৃতি ভারতের অভিজাতবর্গের কাহারও কাছে তাঁহার স্বাধীনতার বাণী প্রচারে কুণ্ঠা ছিল না। কুমারী সিংহবীর্য্য স্বামীজির মতই খাপখোলা তলোয়ার—কখনও তিনি আপন হৃদয়-ভাব গোপন করিতে জানিতেন না। তাঁরই সুপরিচিত বন্ধু "এম্পায়ার" সম্পাদক মিঃ এ জে এফ ব্লেয়ার সাহেব তাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"Ten years ago she was full of the revolutionary ideas which have since obtained so lurid an advertisement all over Asia. And she was far too honest to keep them to herself and as her influence over young Bengal was greater than most people have ever suspected, she probably did more to create an atmosphere of unrest than all the newspapers in the world."—ইহা তাঁহার অসাধারণ, স্বাধীন বিদ্যুৎ-প্রেরণারই প্রতি অকপট শ্রদ্ধাঞ্জলি; বাস্তবিক সিষ্টার নিবেদিতা ভারতে একটা "living nationalism"এরই বনীয়াদ প্রতিষ্ঠাব্রতের অন্যতমা বীজ-ধারিণী তপঃসাধিকা—যোগ্য গুরুর যোগ্যা শিষ্যা!

আর একজন প্রতিভামূর্ত্তি বীরসাধকের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। তিনি আকুমার দেশব্রতী ৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। স্বদেশী যুগের ভাব-ভিত্তি নির্ম্মাণে ইনি অব্যাবহিত পূর্ব্বেই পশ্চিম প্রবাস হইতে বাংলায় ফিরিয়া আসেন ও পরে জাতীয়তার বাউল, সিদ্ধ প্রচারক হইয়াছিলেন। উপাধ্যায় তাঁর বাল্য জীবনে যে ভাবে স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণায় বিভোর হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে "স্বরাজে" গল্পচ্ছলে লিখিয়াছিলেন—"যখন আমার বয়স চৌদ্দ পনরো, তখন সুরেন বাঁড়ুয্যে একটা নূতন আন্দোলন আরম্ভ করেন। কালীবাঁড়ুয্যে আনন্দমোহন বসুও ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। লেকচারে, লেকচারে দেশ মাতিয়া উঠিল। আমার ত খাওয়া দাওয়া নাই—শ্যামের বাঁশী শুনিয়া যেমন গোপীজন উন্মত্ত, আমিও তদ্বৎ। আমার পিতামহী বলিতেন—নেকচারেই দেশটাকে খেলে।...........বিদ্যাসাগরের কলেজে এফ-এ কেলাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। পড়া খুব ভাল হয়—কালেজ খুব জম্‌জমাট—আমার মন কেমন উধাও। সুরেন বাঁড়ুয্যের লেকচার শুনিয়া, দেশের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছি—নিজের ভাবনা ছাড়িয়া পরের ভাবনা বড়ই মিষ্ট লাগে। সুরেন বাঁড়ুয্যে তাঁহার লেকচারে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন—তোমাদের মধ্যে ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি কে হবে? আমরা উৎসাহে হাত তালি দিয়া বলিতাম—সকলে সকলে (all all)। মনে মনে স্থির করিলাম—বিবাহ করিব না—বি-এ, এম-এ পাশ করিব না—প্রাণপণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিব।" প্রাণের আবেগে তিনি

সত্যই দুইবার গোয়ালিয়ারে যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্য পলাইয়া গিয়াছিলেন। সে যুগের সুরেন্দ্রনাথ তরুণ হৃদয়ে দেশোদ্ধারের জন্য এমনি অগ্নিময়ী আবেগকল্পনার সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিতেন —ব্রহ্মবান্ধবের মত যোগ্য পাত্রে তাহা ব্যর্থ হয় নাই।

এই মুক্তি-প্রেরণায় ব্রহ্মবান্ধব চিরদিন উন্মাদ ছিলেন। যৌবন বয়সে ইহা তাঁহার অন্তরে দিব্য মুক্তির সংবাদরূপে যেদিন ফুটিল, সেদিন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আপন মর্ম্ম-বাণী প্রাণ খুলিয়াই দেশকে শুনাইয়া গেলেন—আজিকার বাঙ্গালী, আর একবার অবহিত হইয়া সেই রুদ্র ভৈরবের নিজের মুখেই তাহা শ্রবণ কর—"আমার ঘর নাই—পুত্র কলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, নর্ম্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া সেই নিভৃত স্থানে ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে একি কথা শুনিলাম। কত চেষ্টা করিলাম—কথাটি ভুলিয়া যাইতে, কিন্তু যত ভুলিতে যাই, ততই ঐ কথাটি প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল। কথাটি কি? ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জ্জন ধ্যান ধারণার সময় নয়—সংসারের রণ-রঙ্গে মাতিতে হইবে। নির্জ্জন দেশ হইতে সজনে আসিলাম। আসিয়া দেখি যে আমারি মত দু চারি জন ভবঘুরে লোক ঐ দৈব-বাণী শুনিয়াছে। বিস্ময়ের কথা—এত বড় বড় লোক থাকিতে আমার ন্যায় ধন-জনবিহীন গরীবেরাই কেন এই খেয়ালে মজিল! জানি না ভগবানের কি উদ্দেশ্য!"

তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয় পবন স্পর্শে যেমন শীতার্ত্ত তরুর প্রাণে নব-রাগের সঞ্চার হয়—প্রিয়জন সমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠে—রণভেরী শুনিলে যেমন বীর হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি কি এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। আমি নর্ম্মদার আশ্রম ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি—স্থানে স্থানে স্বরাজ-গড় নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে বিজাতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সেই সকল গড় যজ্ঞীয় হোমধূমে পূত হইবে—বিজয় সিংহনাদে ধ্বনিত হইবে—শস্যশ্যামলতায় পূর্ণশ্রী হইবে।

শুনেছি মুক্তির সংবাদ। আমার জপ তপ বাঁধন ছাঁদন সব ঘুচিয়া গিয়াছে—আকুল পাগল-পারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলাম-গড়ে থাকিতে চাই না। ঐ স্বরাজ-গড় গড়িতে —স্বরাজ-তন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আনচান।"

(৬)

স্বদেশী যুগের পূর্ব্বেই ভাবুক ও মনস্বী বিপিনচন্দ্র তাঁর "New India" পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার ছত্রে ছত্রে মামুলী ভিক্ষা-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা পূর্ব্বক বিপিনবাবু নূতন রাষ্ট্রচিন্তার ধারা প্রবর্ত্তনে প্রয়াসী হন। সার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল তাঁর "ভারতের অশান্তি" বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে মহামতি তিলককে

লোকমান্য তিলক।

"Father of Indian unrest বলিয়া যোগ্য মর্য্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহারই মতানুসারে, বাঙ্গালীদের মধ্যে তিলকের দুইটী প্রধান শিষ্য জুটিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ইঁহারা উভয়ে নাকি তিলকের মহিমাময় প্রভাবে দীক্ষিত হইয়া "ভারত ভারতবাসীর জন্য" এই ভয়ঙ্কর মতের প্রচার করিতে লাগিয়াছিলেন! সে যাহা হউক, বিপিন চন্দ্র "নিউ ইণ্ডিয়ার" ভিতর দিয়া নবভাবের বীজটীকে আপন মৌলিক প্রতিভার আলোকে বেশ যোগ্যতার সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই বীজ অদূর ভবিষ্যতের যুগ-প্রবর্ত্তনে যথেষ্ট কাজ করিয়াছিল।

"নিউ ইণ্ডিয়ার" মূলমন্ত্র ছিল—নূতন স্বাজাত্য-বোধ ও আত্ম-নিষ্ঠা। ভারতে শুধু হিন্দুও নহে, শুধু মুসলমানও নহে, আবার ইংরাজও নয়, এই ত্রিগুণাত্মক সভ্যতাসমন্বিত যে নবজাতি গড়িতেছে, তাহাকে নব স্বাদেশিকতার অনুভূতি লইয়াই দাঁড়াইতে হইবে ও ভিক্ষার পরিবর্ত্তে আত্মত্যাগ ও স্বাবলম্বন নীতি অনুসরণ করিয়া সকল অধিকার আয়ত্ত করিতে হইবে। ১৯০২ সালে তিনি যেন আসন্ন ভবিষ্যতের পদক্ষেপ শুনিতে পাইয়াই পূর্ব্বরাগ গাহিতে-ছিলেন—

"Heaven helps those who help themselves—an old saying this; but it will soon be put to a new test in this country. We have too long looked for help from the outside, to work out our

problems. We have always been begging and begging and begging. The Congress here and its British Committee in London are both begging institutions. We have given a new name to begging: we call it agitation. But agitation in England by the British citizens, who have real political power in their hands, who control election, who control the constitution of the National Legislature, upon whose pleasure, ministers of the Crown have to wait for the continuance of their official life—agitation by such a people is essentially different from our agitation. They can demand, and if not satisfied, they can constitutionally enforce their demand. But we,—we can only pray and petition, beg and cry and at the utmost fret and fume, and here ends all. ...... Agitation is not in any sense, a test of true patriotism. That test is self-help and self-sacrifice; and the time, perhaps, is coming faster than we had thought, when Indian patriotism will be put to this test. Will it be able to stand it? Time will show."
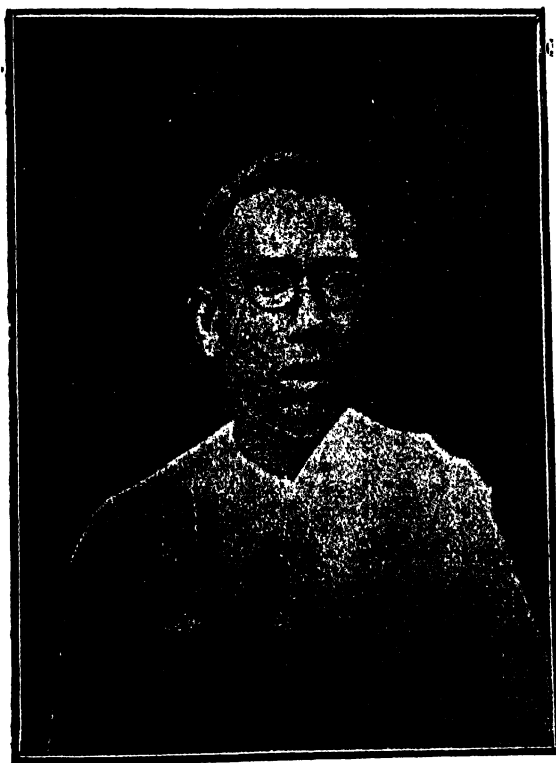
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

কাল সে উত্তর অচিরেই দিবার জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার জাতিকে এই ভাবেই প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল। বিপিনচন্দ্র সেদিন এমনি স্পষ্টদর্শী ও অগ্রগামী নব চিন্তার উন্মেষ করিয়াছেন। বোম্বাই কর্পোরেশনের শার্দ্দুল মিঃ মেহেতা প্রমুখ তদানীন্তন কংগ্রেসনেতৃগণের রাজভক্তিবাদের বহর দেখিয়া, তিনি এই নূতন বিশ্বাসের আলোকে কংগ্রেসের আদর্শ ও পন্থার ঢালিয়া সাজার আবশ্যকতাও অনুমান করিয়াছিলেন ও আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বুঝি বা এই ভাবে চিন্তা-বিরোধ পাকিয়া চলিলে, অচিরে ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাজভক্ত ও জাতীয়পন্থী বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। পুরাতন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ক্রমে তীব্র হইতে তীব্রতর উঠিতে থাকে। "Benevolent despotism" বলিয়া যে বর্ত্তমান ভারতীয় ইংরাজ শাসন-তন্ত্রের বিশেষত্ব, উহার শান্তিদায়ী ছায়াতলে ভারতের জাতীয় জীবনের যে সম্যক বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না—বিপিন চন্দ্র, তিলক প্রভৃতি নবভাবের ভাবুকগণ ইহা খুব জ্বলন্তভাবে অনুভব করিতেন ও স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করিতেন। ইঁহাদের স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতা কংগ্রেসের জন্মদাতা ধুরন্ধরগণ বড় পছন্দ করিতেন না। ক্রমে বিবাদ স্ফুটতর হইতেছিল। বঙ্গভঙ্গের পর, নরম পন্থা ও চরমপন্থা বলিয়া এই দলাদলি অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

(৭)

সুরেন্দ্রনাথ একদিন বাংলার "মুকুটহীন" রাজা ছিলেন। স্বদেশীযুগের পূর্ব্ব হইতে তাঁর নিজস্ব ও তাঁর দলের অবদানের

মর্য্যাদাও বুঝিতে হয় ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাহা স্মরণ করিতে হয়। পঞ্চাশ বৎসর আগে সুরেন্দ্রনাথই বাংলার বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের আদিগুরু ও উদ্বোধয়িতা, এ কথা বলিলে ভুল হয় না, তাঁরই বিদ্রোহী শিষ্য আজ তাঁর চরণমূলে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁর অধিকার আছে। সিভিলিয়ান সুরেন্দ্র-নাথ যেদিন অপমানে লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহত হইয়া, ময়ূরপুচ্ছের মোহ ছাড়িয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলেন, সেইদিন তাঁর একার বেদনা দেশের বুকেও বাজিয়াছিল। রাজসরকারের দরবারে তাঁর স্থান হইল না বটে, কিন্তু দেশের হৃদয়ে তাঁর জন্য আসন পাতা ছিল—সে আসন বড় পুণ্যময়, বড় গৌরবের! দেশ এই স্বাদেশিকতার পূজারী, বজ্রকণ্ঠ রাষ্ট্রগুরুকে গুরু বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, স্বদেশীযজ্ঞের অগ্রণী পৌরহিত্য ভার তাঁহারই স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছিল। সুরেন্দ্র নাথই পঞ্চাশবৎসর আগে অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্ম্মীরূপে মনস্বী, মহাপ্রাণ আনন্দমোহনকে পাইয়া, একসঙ্গে হরিহর আত্মার ন্যায় কলিকাতা ছাত্রসমাজ (Calcutta Student Association) প্রতিষ্ঠা করেন। এই তরুণ ছাত্রমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়াই ইঁহাদের উভয়ের বিশিষ্ট রাষ্ট্রকর্ম্মের সূত্রপাত। সুরেন্দ্র নাথ বাংলার তরুণকে রাষ্ট্রস্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে কেমন উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

৺আনন্দমোহন সত্যই দেশগতপ্রাণ, এক উচ্চহৃদয়, আদর্শ-চরিত্র পুরুষ ছিলেন। নববঙ্গের নির্ম্মাতৃগণের মধ্যে তাঁর স্থান অতুলনীয়। স্বদেশীযুগের আবাহন করিয়াই এই লোকময় মহাপ্রাণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ও ৺কাব্যবিশারদ

অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। যখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়, বাংলায় তখন মরাগাঙ্গে বান আসিয়াছে, মিলনের মহোৎ-সবে বাঙ্গালী মাতোয়ারা। তাঁর সাধের "মিলন-মন্দিরের" (Federation Hall) ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়, পাল্কী-চেয়ারে করিয়া অতি কষ্টে উঠিয়া আসিলেন—হায়, শেষ শুদ্ধ নিঃশ্বাসটুকু দিয়া বাংলার নবজাতিকে আশীষ না করিয়া তিনি মরিবেন কিরূপে! মরণকালেও দেখা গেল—তাঁর বুকে, মর্ম্মের মর্ম্মমধ্যে যাহা লুকান ছিল—গীতা নয়, চণ্ডী নয়—একখানি রেশমী পটীতে আঁকা—"বন্দেমাতরম্।" সার্থক সিষ্টার নিবেদিতা তোমায় "বাংলার নাগরিকশ্রেষ্ঠ" (The first citizen of Bengal) বলিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন—দেশধ্যান, দেশপ্রেম সাধনার তুমি একটী পবিত্র নয়নমণি!

(৮)

স্বদেশী যুগ! —যে সাধনার বীজমন্ত্র দিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, যে সনাতন জাতীয়তার বেদীমূলে অধ্যাত্ম ভিত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন যুগগুরুপরম্পরাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ; উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও সিষ্টার নিবেদিতা, যে মহাভাবের দিব্যমর্ম্ম-কোষ পরতে পরতে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলেন, মুক্তির সিদ্ধ প্রেরণা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে সঞ্চার করিলেন—যার বীণার ছন্দে ছন্দে হৃদয় বাঁধিয়া জাতির হৃদয় দোলাইলেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, পিককণ্ঠ কান্তকবি, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, আরও শতেক বাণীর পূজারী, যার ব্যথার মর্ম্মচিত্র আঁকিলেন, ভাবের ভাষ্য ও বার্ত্তা প্রচার

করিলেন পাঁচকড়ি, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর, কাব্যবিশারদ, কৃষ্ণকুমার, মনোরঞ্জন, সখারাম, মতিলাল, রামেন্দ্রসুন্দর; যার ব্যবস্থা দিলেন আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, আবুহোসেন, আবদার রসুল, কর্ম্ম সাধিলেন অশ্বিনীকুমার, পুলিনবিহারী, সতীশচন্দ্র—যার চরণে ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার উজাড় করিয়া অর্ঘ্য লুটাইলেন সুবোধচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রকুমার, সূর্য্যকান্ত, যতীন্দ্রনাথ—যার লাঞ্ছনার মর্ম্মদাহে আগুনের বিরাট হোমকুণ্ড জ্বালিয়া তাহাতে আহুতি দিলেন বারীন্দ্রকুমার,উপেন্দ্রনাথ ও অগ্নিকুমারগণ, অত্যাচার সহিলেন সুশীলকুমার ও ভূপেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত কত বীর-সন্তান, মরিয়া অমর হইলেন কানাইলাল ও বাঘা যতীন্দ্রনাথ—আজও যে মহাযজ্ঞ ফুরায় নাই, নব পর্য্যায়ে নব শক্তি-পরীক্ষার অভিযানে মহাত্মার নেতৃত্বে কাতারে কাতারে সেনা-বাহিনী চলিয়াছে—চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি যেখানে আজ নবাহুতির হোতা ও নব নব কর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতা—মহামানবের মুক্তি লক্ষ্যে যে অমর যুগস্রোত অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে সহসা নামিয়া, ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কূল হইতে অকূলে আছড়াইয়া, অতলে বা প্রকাশ্যে, সাময়িক সাফল্যে ও ব্যর্থতায় অনিরুদ্ধ বেগেই চিরদিন চলিবে—যাবৎ না কৃষ্ণকালীর মহামিলনে ভারতে দেবরাজ্য, মর্ত্ত্যে আবার আনন্দ কানন, নব বৃন্দাবনের রচনা সার্থক হয়—

সেই যুগের উদ্বোধন, মহান্দোলনের সূচনা—মানুষের দম্ভ ও অহমিকা সেখানে যন্ত্র, ঘটনা উপলক্ষ মাত্র; ভাগবত প্রেরণাস্পর্শে বাঙ্গালী জাতি সেদিন মহাকালের ভেরী শুনিয়া জাগিয়াছিল।

৺আনন্দমোহন বসু।

স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব জাগরণের কাহিনী। উপরের আদেশে, সেদিন বাঙ্গালীর আত্মবিস্মৃত টুটিল, সুপ্তজাতির মোহনিদ্রা ভঙ্গে চারিদিকে প্রাণের চঞ্চল সাড়া পড়িয়া গেল—ভগবানের অব্যর্থ আশীষ নিষ্ঠুর রাজকীয় বিধানরূপে, তার আত্মচৈতন্যে তীব্র কষাঘাত করিয়া, উদ্বুদ্ধ ও প্রেরণাময় করিয়া তুলিল। পরাধীনতার ব্যথা জাতির অঙ্গে অঙ্গে মোচড় দিয়া সেইদিনই বড় নিদারুণ কণ্টকপীড়নের মত বিঁধিল, রুষ্ট, দলিত ভুজঙ্গিনীর মত সমস্ত জাতিটা ক্ষোভে, রোষে, ব্যথায়, লজ্জায়, অপমানে, প্রতিহিংসায় ও অভিমানের দহনজ্বালায় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহা-সমুদ্রের মত ব্যাকুল ও উদ্বেল হইয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত মহাজাতি সেই অসীম মহজ্ঝটিকার মধ্যে তুফানে সাঁতার দিয়া চলিবার শক্তির পরিচয় লাভ করিল। লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘটনা এই আত্মশক্তি বোধ ফুটাইবার দৈব সুযোগ আনিয়াছিল। মরা গাঙ্গে জোয়ার নামিয়াছিল—বাঙ্গালী সেই সুযোগে শুভক্ষণে পুণ্যস্রোতে তরী ভাসাইয়া দিল। এই সময়ে হঠাৎ কাহার মুখে উচ্চারিত হইল—"বন্দেমাতরম্"—আর সারা বাংলা এক মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে সপ্তকোটী কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিয়া উঠিল—"বন্দেমাতরম"—সিদ্ধ-মন্ত্রে বাঙ্গালী মাতৃপ্রেমে দীক্ষা লইল।

দম্ভের মূর্ত্তি লর্ড কর্জ্জন বিধাতার অস্ত্রস্বরূপ ভারতের শাসন-কর্ত্তা হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন। উপর্যুপরি যথাক্রমে তিনি একটীর পর একটী কুটিল রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া, ভারতবাসীর মনে সংশয়ের ঘোরাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া তুলিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া, উন্নতিমুখী বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার গতিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা করিলেন। তারপর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ঘড়ির কাঁটা পিছু দিকে ঘুরাইয়া দিলেন। তিনিই স্বজাতীয় আমলাতন্ত্র ও শোষণতন্ত্রের স্বার্থসংরক্ষণার্থ ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের স্বার্থ পদে পদে বিদলিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ১৯০৩ সালের পূর্ব্বে, তিনি বঙ্গভঙ্গের কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে সফরকালে এই উদ্দেশ্য তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইল। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রথম প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াই বঙ্গদেশে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সরকারের বাঁশী "ষ্টেট্‌সম্যান" পত্রে এই ব্যবস্থার গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাবেই এই মর্ম্মে প্রকাশ পাইল—'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্য এই যে (১) বাঙ্গালী জাতির সমবেত শক্তিকে নষ্ট করা, (২) কলিকাতার রাজনৈতিক প্রাধান্যের উচ্ছেদ সাধন করা; (৩) পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান শক্তির পরিপুষ্টি সাধন করা। মুসলমান শক্তির পুষ্টি সাধিত হইলে তাহা শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্রুতবর্দ্ধনশীল শক্তিকে বাধা দান করিবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন।" পরে লাট বাহাদুরের দপ্তরখানার কাগজপত্রেও মার্জ্জিত মধুভাষায় এই ভেদ নীতির সমর্থন বাহির হইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না।

বাংলার জনমত তীব্র মনোবেদনায় এই ভেদ নীতির, প্রতিবাদ করিতে কোনও ত্রুটি রাখে নাই। গভর্ণমেণ্ট সার্কুলার প্রচারিত ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থার রীতিমতভাবে অন্যায্যতা প্রদর্শনের জন্য কলিকাতায় "Anti-circular society" বলিয়া এক সমিতি গঠন হইল।
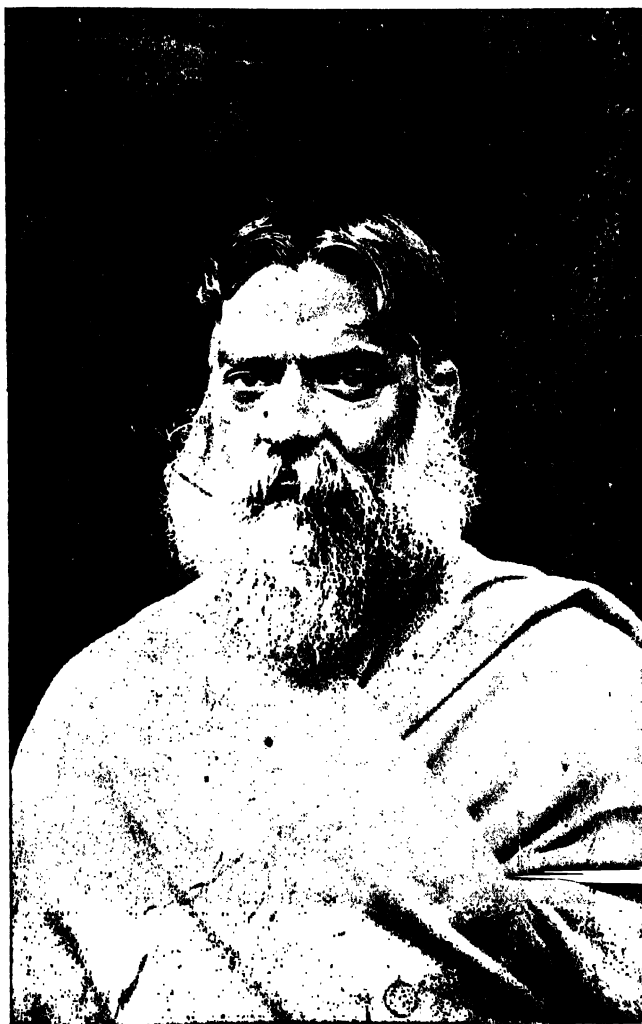
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

রাজধানীতে ও নগরে নগরে ন্যূনাধিক ৬ শত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রত্যেক সভায় ১০ হাজার হইতে ৪০ হাজার পর্য্যন্ত লোক সমবেত হইয়াছিল। তা ছাড়া দেশের রাজন্য ও জমিদারবর্গ, উপাধিধারী ও প্রধানগণ সকলে একবাক্যে এই প্রতিবাদে যোগ দিলেন। উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গ হইতে নাটোর ও দিনাজপুরের মহারাজ ও কাকিনা, দিঘাপাতিয়া ও ডিমলার রাজারা এবং বগুড়ার নবাব বাহাদুর রাজাদেশে অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বিলাতে ভারত সচিব মহোদয়ের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করিলেন। পশ্চিম বঙ্গ হইতে মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কাশিম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীও ভারত সচিবের নিকট তার-যোগে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, জমিদার প্রজা, হিন্দু মুসলমান যাবতীয় অধিবাসী একযোগে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়াছিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গ-মনীষী ও পূজার্হ নেতৃগণের মধ্যে কে না এই প্রস্তাবের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—কিন্তু রাজপুরুষেরা কাহারও কথা কর্ণপাতযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না।

বঙ্গের ৪॥০ কোটী লোক মায়ের এই অঙ্গবিচ্ছেদ রহিত করি-বার জন্য না করিয়াছে কি? এক বেলা না খাটিলে যাহার সমস্ত পরিবার অনাহারে থাকে, এমন দরিদ্র কৃষক, মুটে, মজুর স্বদেশ-

রক্ষার কথা শুনিয়া অর্থ দিয়াছে, কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া রাজ-পুরুষদের নিকটে মনের ব্যথা জানাইবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে, যেখানে সভা সমিতি হইয়াছে, সেইখানেই উর্দ্ধশ্বাসে গমন করিয়াছে। প্রজা আশা করিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহাদের প্রাণের গভীর যাতনা উপলব্ধি করিয়া বঙ্গদেশকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিতে ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু সারা বাংলার কাতর প্রার্থনায় লর্ড কর্জ্জন বা স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার কর্ণপাত করা উচিত মনে করিলেন না। পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারগণ শত প্রলোভন, শত ভ্রূভঙ্গী দেখিয়াও সেদিন ভীত বা বিচলিত হন নাই—তাঁহারা জননী জন্মভূমির অঙ্গে ছুরিকাঘাত হইবে, এই কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা জন্মভূমিকে রাখিবার জন্য কুলি মজুরের ন্যায় দিবারাত্র খাটিয়াছেন, দুইহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকর্ত্তৃপক্ষ দেশের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না।

৪॥৹ কোটী বাঙ্গালীর কাতর প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল। কিন্তু জন কয়েক কয়লা ব্যবসায়ী ইংরাজের আপত্তিতে লর্ড কর্জ্জন ছোট নাগপুর প্রদেশটি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহসী হইলেন না।

যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে একত্র বাস করিতেছিল, পরস্পরের সুখ দুঃখের অংশী ছিল, পরস্পর প্রেম সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতেছিল, শাসন-দণ্ডের একটী আঘাতে তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন করিবার দুর্ম্মতি পরিত্যক্ত হইল না।
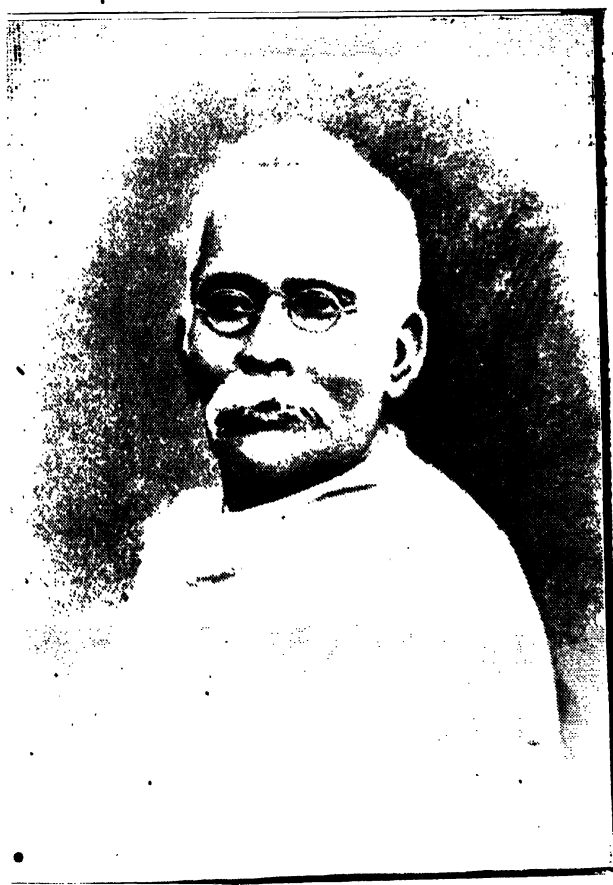
৺অশ্বিনীকুমার দত্ত।

এত প্রতিবাদ, এই তুমুল আন্দোলনেও, করুণ অনুনয় নিবেদন গ্রাহ্য হইবার কোনই লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ায়, বাঙ্গালীর আর মনঃক্ষোভের সীমা রহিল না। নেতৃগণ চিন্তিত হইলেন। সকলেই অতিশয় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। বিমর্ষ চিত্তে সকলেই ভাবিতে লাগিলেন—তবে আর উপায় কি? এমন সময় রাজধানী হইতে দূরে, বাংলার এক সুদূর মফঃস্বলে—বঙ্কিমের পুণ্যকল্পনার পীঠভূমী মৈমনসিংহ জেলা হইতে এই প্রস্তাব উঠিল—বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিলে হয় না!

সারা বাংলায় আগুন ধরিয়া গেল।

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট। টাউন হলের রাক্ষসী সভায় বিশ

এতদ্বিষয়ে হিতবাদীর সহকারী সম্পাদক যোগেন্দ্রবাবুর নিকট আমরা শুনিয়াছি, ৺কাব্যবিশারদ মহাশয়ই সখারাম বাবুর নিকট গিয়া বলেন—"গুরুজীর (সুরেন্দ্র বাবুকে বিশারদ মহাশয় গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন) নিকট শুনিলাম, বঙ্গব্যবচ্ছেদ হইবেই। দুএক সপ্তাহের মধ্যেই গেজেট হইবে।" পরে এবিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনান্তে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন সখারাম বাবু, আমার বোধ হয় এখনও একটা উপায় আমাদের হাতে আছে—যদি আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের গলা টিপিয়া ধরিতে পারি, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুরোধে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবে।" পরে এই কথা সুরেন্দ্রবাবুকে শুনান হইলে, তিনি প্রথমে ইহা impossible (অসম্ভব) বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু পরিশেষে কৃষ্ণকুমার বাবু, গীষ্পতি, আবুহোসেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শান্তে এই প্রস্তাবের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে ঝম্প প্রদান করেন।

সহস্র বঙ্গবাসী প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিল—"বঙ্গভঙ্গের রোধ করা হউক, অন্যথা অসহায় বলিয়া আমরা .অত্যাচার সহিব না, ইহার প্রতীকার করিব—অস্ত্রহীন জাতি আর নীরব থাকিবে না—হাতে না পারি ভাতে মারিব; বণিক ইংরাজের ব্যবসা নষ্ট করিব, বণিক জাতির পকেটে হাত পড়িলে বুঝিবে, বাঙ্গালী জাতি আজ যথেচ্ছাচার সহিতে রাজী নহে —প্রজাশক্তির নিকট রাজশক্তিকে পরাজয় মানিতে হইবে।"

এই বিরাট সভার সভাপতি ছিলেন—কাশিম বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে, দেশের কণ্ঠে সেদিন স্বপ্নাতীত স্পর্দ্ধার বাণী গর্জ্জিয়া উঠিল। দেশের দৌর্ব্বল্যবোধ যেন এক নিমিষে তিরোহিত হইল, লক্ষ কণ্ঠের প্রতিজ্ঞা গগন বিদীর্ণ করিয়া প্রতিধ্বনি তুলিল—'বিলাতী দ্রব্য আর স্পর্শ করিব না।" অসমুদ্রহিমাচল "বন্দেমাতরম" শব্দে মুখরিত হইল।

জাগরণের সে নূতন প্রভাত। বাঙ্গালীর প্রাণে অজস্র বিদ্যুৎ-বৃষ্টি হইল। তরঙ্গে তরঙ্গে সে বিদ্যুৎশক্তি দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। সে কি উৎসাহ, সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বাংলার ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই। শুধু বাংলা কেন, জগতের ইতিহাসে বা এমন মহা জাগরণের তুলনা কোথায়!

(১০)

প্রজার প্রতিবাদে রাজপ্রতিনিধি অটল রহিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর ঘোষণা করিলেন—১৬ই অক্টোবর অবধারিত বঙ্গবিভাগ

৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠিত হইবে। ঘোষণানুসারে যথাসময়ে বঙ্গজননী দ্বিধাবিভক্ত হইলেন। আপাত পক্ষে ভেদনীতির জয় হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর অভেদ প্রতিজ্ঞা বজ্রাদপি অটুট ও দৃঢ় হইয়া উঠিল।

৩০শে আশ্বিন, বঙ্গভঙ্গ দিনে, অখণ্ড বঙ্গের নেতৃবৃন্দের পরিচালনায়, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র অনুসারে সারা বাংলার নগরে নগরে ঘরে ঘরে "রাখীবন্ধন" মিলনোৎসব সম্পন্ন হইল :—

"৩০সে আশ্বিন তারিখে বঙ্গবাসীর দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। বাঙ্গালী মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে। সেদিন—

১। সমস্ত বাঙ্গালী নরনারী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কাহারও রন্ধনশালায় অগ্নি জ্বলিবে না।

২। সকলে দুগ্ধ বা ফলাহার করিয়া অথবা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবেন এবং যিনি রাজার উপরে রাজা, পতিত জাতির উদ্ধারকর্ত্তা, দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবেন।

৩। বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে ও নগরে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলে একত্র হইয়া মহাব্রত গ্রহণ করিবেন।

(ক) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন। (খ) স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার। (গ) স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে আপন শক্তি ও অর্থ নিয়োগ (যথা, কল কারখানা স্থাপন, গৃহে গৃহে চরকার প্রচলন ইত্যাদি।)

৪। সেদিন সমস্ত বঙ্গবাসী স্নানান্তে পরস্পরের হস্তে "রাখী-বন্ধন" করিবেন এবং চিরদিন সুখে দুঃখে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গবাসী

সমুদয় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পরস্পরের সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন।”

বাঙ্গালী সেদিন উন্মাদ। নগরের রাজপথে, পল্লীর হাটে মাঠে, সারি দিয়া অসংখ্য তরুণ হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীষ মাথায় শোভা-যাত্রায় বাহির হইয়াছে, স্বদেশপ্রেমের মাদকতায় নেশাখোরের মত, উন্মত্তের মত নগ্নপদে, অনাবৃত অঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতেছে—

“'ভাই ভাই এক ঠাঁই,
ভেদ নাই ভেদ নাই”

মাতৃমন্ত্র গাহিতে গাহিতে, কোটী চক্ষে অশ্রু উথলিয়া প্রীতির অনুরাগে সে যে কি মধুময় আবেশ, কি অনির্ব্বচনীয় অমৃতানুভূতি, যে না পাইয়াছে, মৃণ্ময়ী জননীর চিন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করা তার পক্ষে সম্ভব হইবে না। মাতৃপ্রেমের অফুরন্ত সুধাপানে বিভোর হইয়া কোটী নরনারী যুক্তকরপুটে মঙ্গলাশীষ প্রার্থনা করিতেছে—

বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান্!
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান্!

শিশির কুমার ঘোষ

বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর কাজ, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্!
বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন।
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্!

আর মায়ের চরণরেণুর পরশদান মাথায় ছোঁয়াইয়া—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই"

বলিয়া অপূর্ব্ব নব জীবনের সঞ্চার, সরল, স্বাভাবিক প্রাণের পরতে পরতে অনুভব করিয়া, নূতন প্রেরণার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সেদিন স্বদেশপ্রেরণার উৎস, সেদিন সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্র নাথ প্রভৃতি এদিনকার রাজপারিষদগণও উৎসাহবক্ষে, নগ্নপদে ইংরাজের বঙ্গভঙ্গ বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" বঙ্গললনাকুলকে মাতাইয়াছে। লর্ডকর্জ্জন ও স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার যে ঘোষণা পত্রে স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্কুরেই বিনাশ সম্ভাবনা গর্ব্বভরেই আশা করিতেছিলেন—'a cloud no bigger than a man's hand in the eastern sky'—পূর্ব্বাকাশে এক

টুকরা মেঘ মাত্র মনে করিয়া ফুঁ দিয়া উড়াইবার চেষ্টায় ছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘই সমস্ত বঙ্গগগন ছাইয়া ফেলিল—সেই ঘোষণাপত্রই কাল হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বঙ্গবাসী প্রতিঘোষণা প্রচার করিয়া ১লা নভেম্বর গভর্ণমেণ্টকে জানাইল—

"সাড়ে চার কোটী বাঙ্গালীর একমতকে পদদলিত করিয়া, রাজকর্তৃপক্ষ যখন বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করাই স্থির করিলেন, সমগ্র বাঙ্গালীজাতির পক্ষ হইতে এই ভেদনীতির কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য, জাতির অখণ্ড একত্ব ঘোষণাপূর্ব্বক আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম—আমরা ভাই ভাই এক রহিব। ঈশ্বর আমাদের এই ধ্রুব সঙ্কল্পের সহায় হউন।"

দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীর পক্ষ সমর্থনে, পরবর্ত্তী জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে, সভাপতি ৺গোখলে মহোদয়ও এই এই মর্ম্মে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন—"অমঙ্গলেও মঙ্গল হয়, বঙ্গে যে দুর্দ্দিন যাইতেছে, তাহার এই শুভফল প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইংরাজ রাজত্বে এই প্রথম সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, একযোগে রাষ্ট্রকার্য্যে যথেচ্ছাচারের প্রতিবিধানে যত্নপর হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশে অপূর্ব্ব জাতীয়ভাবের উন্মেষ হইয়াছে················এই ব্যাপার উপলক্ষে এ দেশের প্রজাসাধারণ যে শক্তি লাভ করিল, তজ্জন্য বঙ্গবাসীর নিকট সমগ্র ভারত চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আমি আশ্বাস দিতেছি, অদ্য সমগ্র ভারতবাসী বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান। বাংলার নেতৃগণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্মরণ রাখিবেন যে তাঁহাদিগের হস্তে সমগ্র ভারতের সম্মান সংন্যস্ত রহিয়াছে।"

সত্যই সে মহা জাতীয় আন্দোলনে সেদিন সমস্ত জাতির অন্তরাত্মাই হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে—কবি, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, জমিদার, রাজন্যবর্গ হইতে সামান্য দিনোপজীবি পর্য্যন্ত, বাংলার যে যেখানে হৃদয়বান্, মনীষি ছিলেন, সকলেই প্রাণের তারে কিসের সাড়া অনুভব করিয়া, দেশযজ্ঞে স্ব স্ব আহুতি লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন—জাতির মর্ম্ম ভরিয়া এক অভেদ, অনির্ব্বচনীয় মাতৃ-সত্তার অনুভূতি তর-তর-প্রবাহে মহৎ ও অনু সকলকেই ভাসাইয়া, পুণ্যস্নাত করিয়া দিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ এই বিরাট আন্দোলনের সুদূরগামী ব্যাপকতা অন্তর্দৃষ্টি দিয়া উপলব্ধি করিয়া পরে ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"the chief current of a world-wide revolution"—জগদ্প্লাবী মহাবিপ্লবের ইহাই মূল প্রবাহ।

(১১)

স্বদেশীর প্রবল গতি রুদ্ধ করিবার জন্য গোড়া হইতেই রাজ-কর্তৃপক্ষগণ সচেষ্ট হইলেন। কার্লাইল ও লিয়ন সাহেবের "এ্যান্টি-স্বদেশী" সার্কুলার দমননীতির প্রথম নমুনারূপে প্রচারিত হইল। তারপরে কুখ্যাত রিজলী সার্কুলার, উহাই ইন্ধনস্বরূপ, বাংলার তরুণ জীবনে গোলামখানার কুশিক্ষার বিরুদ্ধে যে ধূমায়িত বিতৃষ্ণা তাহাকে জাগাইয়া, জাতীয় শিক্ষার নবায়তন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। সেদিন কলিকাতার ছাত্রমহলে যে তুমুল জাগরণ-

চাঞ্চল্য, বাংলায় আর একবার চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে এদিনে যে উৎসাহদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেবল ইহারই সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। ১৯০৬ সালের ১৪ই আগষ্ট ডাঃ রাস বিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে "বঙ্গীয় শিক্ষা-পরিষৎ" সংস্থাপিত হয়। আমাদের যতদূর স্মরণ আছে, রংপুরেই প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়,—পরে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অঙ্গাধীনতায়, বাংলার বিভিন্ন জেলায় এইরূপ অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতায় নেতৃগণের উদ্যোগে একটী "জাতীয় ধনভাণ্ডারও" (National Fund) আরম্ভ করা হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর শাসন চলিতেছিল—পূর্ব্ববঙ্গে। সার ব্যামফাইল্ড ফুলারের রাজ্যে অবিচার ও যথেচ্ছাচারের অন্ত ছিল না। কিন্তু দেশের মাথায় সর্ব্বপ্রথমে বড় আঘাত বাজিল, বরিশাল প্রাদেশিক সভা-ভঙ্গের ব্যাপারে। ১২ই এপ্রিল প্রতিনিধিবর্গের উপর সহসা পুলিসকর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রমণ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইমার্শন সাহেবের আদেশে পরদিবস সভাভঙ্গের আদেশ দেওয়া হইল। আদেশ অমান্য করায়, নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠে লাঠি চলিয়াছিল। ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার যোগ্য পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন ও আরও কয়েকটি যুবক মারপিঠে কঠিন রূপে জখম হইয়াছিলেন। রাস্তায় রক্তের নদী বহিল, নির্ভীক যুবকগণ "বন্দেমাতরং" ধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অপরাধী বালকের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া
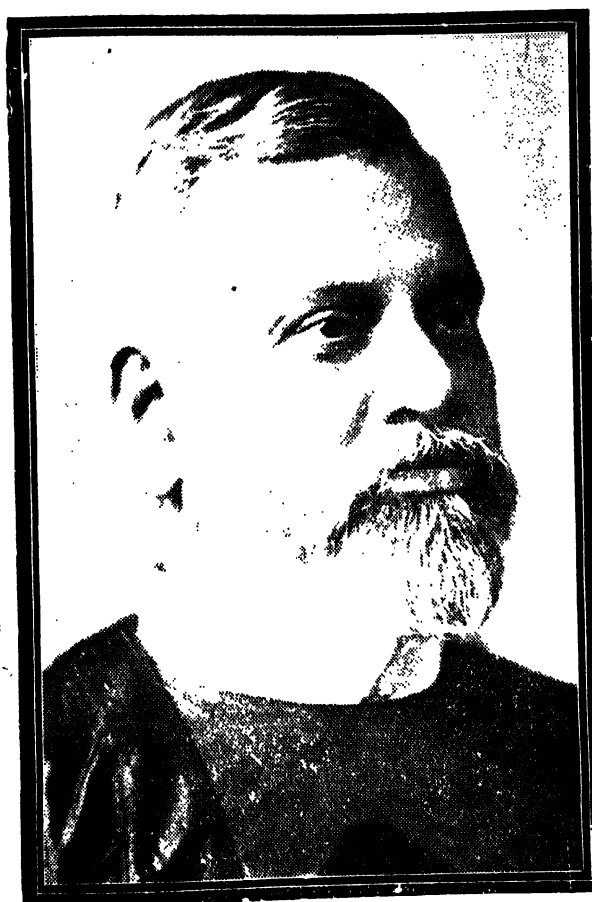
৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

থাকিতে হইয়াছিল। অত্যাচারের এমনি নগ্নরূপটি দেখাইয়া, সেই দিন হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শরূপে বাঙ্গালীর হৃদয়ে ইংরাজের স্থান অসম্ভব হইয়া উঠিল! ধীরবুদ্ধি ভূপেন্দ্রনাথের মত নায়কের মুখে সেদিন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বাহির হইল—This is the beginning of the end! "—ইংরাজ শাসন-তন্ত্রের এই অবসানের সূচনা হইল।

এই অপমান বাঙ্গালী হজম করিতে পারে নাই। লাঠির বিরুদ্ধে লাঠি চালাইবার হিংস্র ক্ষুধা বাঙ্গালীকে বড় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বঙ্গললনাকুল এই বরিশালের কাণ্ডে, স্বামী পুত্রগণের অপমানে ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে, অঙ্গের অলঙ্কার মোচন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—এই অপমানের প্রতিবিধান না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অঙ্গে আর বিলাসদ্রব্য ধারণ করিবেন না। সংবাদটী দেশব্যাপী হইয়া পড়িলে, একজন রাজকর্ম্মচারীর মুখ হইতেই শুনা গিয়াছিল—দেশে কি এমন লোক নাই যে প্রতিশোধ লইতে পারে! বাঙ্গালীর হৃদয় মথিয়া সেদিন এমনি প্রতিবিধিৎসার নির্ম্মম মর্ম্মবাণীই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তারপর একে একে ঘটনার প্রবল তরঙ্গাবর্ত্তে বাঙ্গালীর শান্ত আন্দোলনকে নিষ্ঠুর শক্তিপরীক্ষায় পরিণত করিয়া তুলিল।

কর্জ্জন-ফুলারের দমননীতি শুধু এইখানেই নিরস্ত হইল না। লাটসাহেবের "পিয়ারী পত্নী" বলিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমান সমাজকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, ভেদ-নীতির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার হিন্দু বিদ্বেষ প্রচারের

ফলে, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু প্রজার উপর মুসলমানের অমানুষিক অত্যাচার সংবাদ বাঙ্গালীর সহিষ্ণুতার তন্ত্রী ছিন্ন করিবার উপক্রম করিল। কুমিল্লায় যখন গুপ্ত প্ররোচনায় ভ্রাতৃদ্রোহে উদ্বুদ্ধ মুসলমান গুণ্ডা হিন্দু পল্লীতে লুণ্ঠনাদি ভীষণ উৎপাত করিতেছে, নিরস্ত্র গৃহস্থকুল সশঙ্ক, তাহাদের ধন প্রাণ, পথে ঘাটে হিন্দু রমণীর যথাসর্ব্বস্ব সতীমর্য্যাদা কে রক্ষা করে তার ঠিক নাই, পল্লী-পথে শ্মশান-দৃশ্য, তখন ঘোর নৈশ অন্ধকারে এক তের বৎসরের বীর বালকের কণ্ঠে হঠাৎ "বন্দেমাতরম্" শব্দ উত্থিত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে বুম্ করিয়া বন্দুকের ধ্বনি শুনা গেল—লোকে ইহার মধ্যে দৈব ঘটনার অনুমান করিয়াছিল। তারপর কুমিল্লার অত্যাচার শান্ত হয়। কিন্তু তখন হইতে হিন্দুগণ পাড়ায় পাড়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষায় যত্নপর হইল। ঢাকায় ও ভোলায় দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত হওয়ায়, হিন্দুদের এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ উদ্বুদ্ধতার পরিচয় পাইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট অচিরে শান্তি স্থাপন করেন। কিন্তু ময়মনসিং জেলার জামালপুর গ্রামে ব্যাপার বড় গুরুতর দাঁড়াইল। হিন্দুদের দোকান ও কাছারি মুসলমানেরা লুণ্ঠন করিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তের জন আহত হইল। গুণ্ডাদের তাড়া খাইয়া প্রাণের ভয়ে কেহ নদীতে ঝাঁপ দেয়, জলে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। তারপর দস্যুরা বাসন্তীদেবীর মন্দিরে ঢুকিয়া মায়ের মূর্ত্তি চুরমার করিয়া দিল। হিন্দুর শেষ আশ্রয় ধর্ম্ম, তাহাও যাইতে বসিল। সেই সময়ে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছিলেন—"বাজারে গিয়া দেখিলাম, হিন্দুদের দোকানের দরজা ভাঙ্গা, মুসলমানেরা দোকান লুট করিয়া লইয়াছে।

জামালপুরে প্রতিমা ভঙ্গ।

দুর্গাবাড়ীতে যাহা গিয়া দেখিলাম, তাহাতে আর হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছা হইল না। দুর্গা ছিন্নমস্তা, কার্ত্তিকের হীনশীর্ষ, গণপতি কণ্ডিত তুণ্ড। আঘাতের শতচিহ্ন মার অঙ্গে বিরাজমান!"—ঐ দেখ মা যাহা হইয়াছিলেন!

নবাবগঞ্জেও কালীর গলায় জুতার মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পূর্ব্ব বাংলার মুসলমানগণকে সেদিন প্রলুব্ধ বাক্যে ভুলাইয়া, তীব্র বিদ্বেষ মন্ত্রে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাল কাগজে জেহাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। ভায়ের বিরুদ্ধে ভাইকে আততায়িতায় প্ররোচিত করা হইয়াছিল। মেলান্দহ হাটের দাঙ্গার রিপোর্টে সবডিভিসনাল অফিসার লিখেন—"কতিপয় মুসলমান ঢক্কা পিটিয়া প্রচার করিয়াছিল যে, সরকার মুসলমানদিগকে হিন্দুদের দোকান সম্পত্তি লুঠ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।"

হরগিলারচরের সতী হরণ ব্যাপারের তদন্তে ম্যাজিষ্ট্রেটের মন্তব্যে প্রকাশ, "ঐ সকল নারীনির্য্যাতন ঘটনার মূলে, এই প্রকার ঘোষণা প্রচার হয়, যে মুসলমানেরা হিন্দু বিধবাকে নিকা করিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।"

পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে 'পিকেটিং' করায় বাধা দিবার জন্য বাজারে গুর্খা punitive (পিটুনী) পুলিশ বসান হইয়াছিল। এই সকল খুঁটি নাটি উপলক্ষ করিয়া বহুস্থলে দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। কুমিল্লায় কে সিভিল সার্জ্জনকে নদীর জলে ঠেলিয়া দেয়, ঢাকায় তিন জন লোক খুন জখম হয়। এই প্রকার নানা রূপ

অশান্তি ও উৎপাতের উত্তেজনায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ দিন দিন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

পশ্চিম বঙ্গের অবস্থাও নিরুপদ্রব ছিল না। বিপ্লবপন্থীর দল রাজধানীর বুকে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ইতিমধ্যে অগ্নিমন্ত্রপ্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। দুই বৎসরের মধ্যে 'যুগান্তর" পত্রের বিক্রয় ৭০০০ উপরে উঠিয়াছিল। ওদিকে ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" অপূর্ব্ব লৌকিক ভাষায় দেশের প্রাণ হইতে জুজুর ভয় তাড়াইতে চাবুকের কষাঘাত করিতেছে—দোকানী পশারি, মুদী ফেরিওয়ালার পর্য্যন্ত প্রতিদিনের "সন্ধ্যা" না হইলে চলে না। কলিকাতায় তুমুল ভাবের উত্তেজনা চলিয়াছে। এমন সময়ে ৫ই জুলাই 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্র নাথ ধৃত হইলেন। ১৯০৭ সালের ১৭ই জুলাই তাঁর ১বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হইল। ভূপেন্দ্র বীরদর্পে সমুদয় অপরাধ আপন স্কন্ধে বরণ করিয়া সকলকে চমকিত করিলেন, পরে হাসিতে হাসিতে কারাগমন করিলেন। দেশে উৎসাহ চাঞ্চল্যের অবধি রহিল না। ভূপেনের গরীয়সী—বীর বিবেকানন্দের যোগ্যা—জননী সগর্ব্বে ব্যক্ত করিলেন, "আমার সন্তান দেশের জন্য কারাগারে গিয়াছে ইহাতে আমার দুঃখ নাই। ভূপেন জেলে গিয়াই দেশের বেশী উপকারে লাগিল!" ভূপেন্দ্র নাথের দৃষ্টান্তে, পর পর অনেকগুলি সন্তানকে একই পত্রের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া জেলে যাইতে হয়।

"যুগান্তরের" মামলার পর, "সন্ধ্যা" ঠাট্টা করিয়া লিখিল—'ভূপেনের বেলায় জোড়া রম্ভা, সন্ধ্যার বেলা বাঁশ লম্বা!" পরে

৺সুশীল সেন। (১৯০৮ সালে)

দুইটি প্রবন্ধে সিদিশান উপলক্ষে, ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে তাঁর অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বৃদ্ধি পাইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাঁহাকে দুইদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। যখন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, জেলের হাঁসপাতাল তীর্থস্থানে পরিণত হইল। যেদিন অপরাহ্নে তিনি জনৈক বন্ধুকে বলিলেন—"আমি ফিরিঙ্গির জেলে বেগার খাটিব না। আমার ডাক আসিয়াছে। আমাকে কারাগারে রাখে এমন সাধ্য ফিরিঙ্গির নাই।'—হায় কে জানিত, তাহার পরদিনেই বীরযোগীর তেজোগর্ব্বিত স্পর্দ্ধাবাণী এমন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইবে ? চিরকুমার মুক্তিব্রতী সন্ন্যাসী প্রিয়জন্মভূমির মুক্তি ধ্যান করিতে করিতে সকল বন্ধনকে উপহাস করিয়া, হাসিতে হাসিতে মহাপ্রস্থান করিলেন। মরণের একমাস পূর্ব্বে কালী-ঘাটের নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"মা, আবার ব্রাহ্মণদেহ দিও—কুড়ি বৎসর পরে আবার এদেশে জন্মিয়া ফিরিয়া তোমার কার্য্যে আসিব—তোমার মুক্তিব্রত উদ্‌যাপনে আমার দেহ লুটাইব।" যাও ধর্ম্মবীর, জন্মে জন্মে তুমি এমনি বীরগর্ব্ব লইয়া আসিও, লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারতবাসীকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিও।

দ্বিতীয় "যুগান্তর" মামলার কালে, কিংস্ফোর্ড সাহেবের এজলা-সের সম্মুখে দুই তিনটি যুবকের ভিড়ের মধ্যে পুলিশের সঙ্গে হাতা-হাতি হওয়ায়, একটী ১৫ বৎসর বর্ষীয় কিশোর পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে মুষ্টির প্রতিঘাতে মুষ্টি ফিরাইয়া দেয় ও কয়েকজনের সহিত অসীম সাহসে লড়াই করে। এই বালকেরই নাম সুশীলকুমার—কিংস্ফোর্ড সাহেবের বিচারে ইহার ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশারদের গান—'আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে, আমি কি মার সেই ছেলে?'—সুশীল হাসিতে হাসিতে প্রথম সার্থক করিল। দেশে আবার একটা বিদ্যুতের উত্তেজনা শিহরিয়া গেল। এই সুশীলকুমার পরযুগে, বিপ্লবের রক্তযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছিল।

তারপরে "বন্দেমাতরমের" পালা। বিপিনচন্দ্র নির্ভীক হৃদয়ে তাঁর বিবেকের নির্দ্দেশমত এই অন্যায় মামলায় সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হইলেন। গভর্ণমেণ্ট সুযোগ পাইলেন—যাঁর শৃঙ্গনাদে দেশ ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, তাঁকে ছয়মাস বিনাশ্রমে জেলে পুরিলেন। কারাপথের পথিক বিপিনচন্দ্র দেশের নূতন প্রেরণার উৎস স্বরূপ হইয়া জেলে গেলেন।

কলিকাতায় বিডন-বাগানের দাঙ্গাও এই কালের আর এক গুরুতর ঘটনা। পুলিশ সভার বিস্তৃত জনতাকে ঘেরাও করিয়া সহসা রেগুলেশন লাঠির চালনায় প্রবৃত্ত হয়, নিরস্ত্র লোকে প্রথম হতবম্ব হইয়া পলায়নপর হইলে, পুলিশ তাহাদের তাড়া করে ও প্রহার করিতে থাকে। তখন জনতা ফিরিয়া, লাঠি কাড়িয়া, মরিয়া হইয়া, আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইল। ফলে বিচ্ছিন্ন লাল-পাগড়ীর দল এই জনতার সম্মুখে হটিয়া সরিয়া পড়িল। রাত্রে রাজপথ যখন জনশূন্য, তখন নিরীহ পথিকদের ধর পাকড় আরম্ভ হইল। দুইদিন ধরিয়া কলিকাতায় পুলিশ ও গুণ্ডার রাজত্ব চলিল। প্রতিশোধে কয়েকস্থানে পুলিশও মার খায়—একজন সার্জ্জন খানাতল্লাস কালে সিঁড়িতে উঠিতে গিয়া দায়ের ঘা খাইয়া,

শ্রীচিত্ত রঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও আহত যুবকদ্বয়।

আবুহোসেন, গীষ্পতি (দাঁড়াইয়া), লিয়াকৎ হোসেন

হাতখানি খোয়ায় ও স্থানে স্থানে সোডা বোতল ছুঁড়িয়া খুন জখম হয়। এই ভীষণ ঘটনার তদন্ত করিবার জন্য উভয়পক্ষের কমিশন নিযুক্ত করা হয়। দেশবাসীর পক্ষে ৺নরেন্দ্রনাথ সেন কমিশনের সভাপতি হন। রিপোর্টে পুলিশের অকারণ আক্রমণের জন্য তীব্র সমালোচনা করিতে হইয়াছিল।

পুলিশের হস্তক্ষেপেই যে এই অশান্তি, তাহা কয়েকদিন পরে ৩০শে আশ্বিনের উৎসবে প্রমাণিত হইয়া গেল। এই সভাধিবেশনের পূর্ব্বে মান্যবর ৺ভূপেন্দ্র বসু বঙ্গ-লাটকে দেশের পক্ষ হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জানাইলেন—গভর্ণমেণ্ট পুলিশ সরাইয়া লইলে, সভায় কোন প্রকার শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই। পুলিশসেনা প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদের নিবৃত্ত করা হইল। সভার কার্য্য আদ্যোপান্ত শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইল।

কলিকাতার সমস্ত চত্বারে ১৪৪ ধারা প্রবর্ত্তনে সভা করা প্রতিষিদ্ধ হইল।

এই সময়ে অদম্য স্বদেশীপ্রচারক মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন মুখখোলা অপরাধে ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

১৯০৭ সালের, শেষভাগে, গোয়ালন্দ ষ্টেশনে ঢাকার মাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেবর উপর গুলি চলিল। দেশ চমকিয়া ভাবিল—একি! সকলে বুঝিল, রক্ততান্ত্রিকগণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এই লোমহর্ষণ ঘটনার পর, কুষ্টিয়ায় পাদরী হিকেন বোথামের উপর গুলি চলিল। বাঙ্গালী যে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত

হইয়াছে, এই ভাবিয়া সকলে একটা নূতন গর্ব্ব ও উত্তেজনা অনুভব করিল, ঘরের কোণে বসিয়া সন্তর্পণে তাহার আলোচনা করিতে লাগিল।

* * * *

স্বদেশীযুগের এক অঙ্কের অবসান হইল। ১৯০৮ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী রক্তের আঁকর টানিয়া এক নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে—সে ইতিহাসের লাল পাতাগুলি উল্টাইয়া যাইবার স্থান এ প্রসঙ্গে নহে। বাংলার তরুণ বুকের রুধির ঢালিয়া যে হোরী খেলায় প্রবৃত্ত হইল, সে রক্তরঙ্গে মাতিয়া জাতীয় জীবনের শুদ্ধ, শুভ্র যে আত্মপ্রকাশ, তাহা আর ঘটিয়া উঠা সম্ভব হইল না। বাংলার রাষ্ট্র-সাধনায়, এই স্বচ্ছ আত্মপ্রকাশ কয়েকটী বিশিষ্ট ধারা টানিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাঙ্গালী চাহিয়াছে স্বরাজ, চাহিয়াছে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন, চাহিয়াছে জাতীয় শিক্ষা—স্বদেশীর সাহায্য করে চাহিয়াছে বহিষ্কার—বিদেশীর সাহচর্য্য, বিশেষ বিদেশী পণ্যবাণিজ্যের বয়কট—এই চতুরঙ্গ প্রেরণা ধরিয়াই বাংলার স্বদেশীযুগের সাধনা গোড়া হইতে আত্মনিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে। এই প্রেরণার বশেই বাঙ্গালী চরমপন্থী মারাঠী চরমপন্থীর সহিত হাতধরাধরি করিয়া কলিকাতা কংগ্রেসে ভারতের রাজনৈতিক পিতামহ ৺দাদাভাই নৌরজীর মুখে ‘স্বরাজ’ মন্ত্র বলাইয়া লইয়াছে, গতানুগতিক ভিক্ষা-নীতির দুর্গাধিকার করিবার উৎসাহে, সুরাটের দক্ষযজ্ঞে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়াছে, নূতন জাতীয় দল গঠন করিতে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। এই স্বল্প-

৺দাদাভাই নৌরজী

পরি সর কয়েক বর্ষ কাল, অথচ তাহারই মধ্যে যে বিচিত্র যৌগিক ক্রমে জাতি-জীবনের অদ্ভুত বিবর্ত্তন, তাহার সকল কথা গুছাইয়া বলিতে গেলে এক মহাপুরাণ রচনা করিতে হয়, এখানে কেবল একটী অধ্যায়ের সূচীপত্র দিতে পারিয়াছি—ইহা স্বদেশী যুগের এক পৃষ্ঠা মাত্র। আসল কথা সবখানিই বাকী রহিয়া গেল।

বাঙ্গালীর ইহা জীবন-বেদ, তার কতটুকু স্মৃতি উদ্ধার করিতে পারিলাম ? সেই পার্টিশেন হুকুম অবধি তাহার রদ হওয়া পর্য্যন্ত, বাঙ্গালীর দৃঢ়পণে settled fact unsettled করা, ইহারই মধ্যে কত ঘটনা ছাড় পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের মৌলিক তপঃশক্তি জাতীয় সঙ্কল্পকে উক্ত বিশেষ ঘটনায় জয়যুক্ত করিয়াছে, কিন্তু জাতীয় দল যে ভবিষ্যতের নবস্বপ্নের প্রেরণাদৃষ্টি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল, তাহার সার্থকতার সুযোগ অভাবে জাতীয় জীবনে এই নূতন তপঃ-শক্তি অপূর্ণ আকাঙ্খা লইয়া ধীরে ধীরে ধ্যান গুহায় অবগাহন করিয়া, কেন আত্মগোপন করিল—তার নিগূঢ় কারণের উন্মেষ কিছুই করা হইল না। লর্ড মিণ্টোর 'honest swadeshi'র কথা, ফুলারের পদত্যাগের কথা, সুরাটের জুতা বিভ্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া বৈকুণ্ঠ সেনের 'impatient idealists' অভিধান দেওয়া পর্য্যন্ত নরম গরম দলের ঘটনাঘটনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কথা, বোমার আবির্ভাবে কলিকাতাব্যাপী প্লাকার্ড "Beware the Nunia is coming" তাহার কথা—সবই ত বলা বাকী রহিল। একদিকে রক্তপন্থী বিপ্লবতন্ত্রী, অন্য-দিকে দমনোৎসুক রাজশক্তির মুখোমুখি সংগ্রাম, আইনের নখদন্ত

বিকাশের সঙ্গে অগ্নিনালিকার ধস্তাধস্তি, ৩ রেগুলেশনে বাংলার নবরথীর নির্ব্বাসনদণ্ড, সূর্য্যাস্ত বিধি, কণ্ঠরোধ আইন, প্রেস আইন, সমিতি আইনের প্রয়োগ, প্রভৃতি সকল কথা—সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রবেশ, তাঁর কারাসাধনা ও মুক্তি, তাঁর "ধর্ম্ম" ও "কর্ম্মযোগিনের" মধ্য দিয়া নব দিব্য জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার, তাঁর "Open letter to my countrymen" ও সিষ্টার নিবেদিতার পরামর্শ, পরিশেষে অজ্ঞাতবাস—স্বদেশীযুগের বিকাশ ও পরিণতির মর্ম্ম সবই ইহার মধ্যে নিহিত—সে সব অবর্ণিত রহিল। জাতীয়ভাবের আত্মপ্রকাশের আজ সময় নহে বলিয়া, শ্রীঅরবিন্দ যে শেষ কথাটা আমাদের নিকট রাখিয়া, নবযুগের সৃষ্টি সাধনায় মহাডুব দিলেন, এখানে শুধু তাহারই গুটি-কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে উপসংহার করি—

"We have worshipped the Country, the National Mother as God. That was well, that carried us far. But it was only a stage to bring the Europeanised mind, back to spirituality. It was the worship of a *rupa*, an *ishta*, by which to rise to the worship of God in His fullness. We used the mantra, "Bandemataram" with all our heart and soul and so long as we used and lived it, relied upon its strength to overbear all difficulties, we prospered. But suddenly the faith and the courage failed us, the cry of the mantra began to sink and as it rang less feebly, the strength began to

শ্রীঅরবিন্দ ও ৺মৃণালিনী

fade out of the country. It was God who made it fade and falter, for it had done its work. A greater Mantra than "Bandemataram" has to come. Bankim was not he ultimate seer of Indian awakening. He gave only the term of initial and public worship, not the form and the ritual of the inner secret *upasana* ....when the mantra is practised even by two or three, then the closed Hand will begin to open; when the *upasana* is numerously followed, the closed Hand will open absolutely."

সেই গূঢ় উপাসনা কি? ঋষির কণ্ঠেই বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা উহা শুনিয়া লইয়াছে, নবীন মাতৃমন্দিরে সেই অনাহত ঋক্‌মন্ত্রই আজ সুরে লয়ে ঝঙ্কৃত হইতেছে—

—"It is a national *Atmasamarpana*—self-surrender that God demands of us and it must be complete."

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

Then the promise will come true.

অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

ওঁ

প্রথম খণ্ড

সমাপ্ত